সর্ব্ব-স্বাধীন শ্যাম

ভূ-পর্য্যটক
শ্রীরামনাথ বিশ্বাস
মরণবিজয়ী চীন, দুরন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা, মলয়েশিয়া ভ্রমণ,
মুক্ত মহাচীন প্রভৃতি রচয়িতা

ভট্টাচার্য্য সন্‌স্‌ লিমিটেড
১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

মূল্য দুই টাকা বার আনা মাত্র

প্রথম সংস্করণ—নভেম্বর, ১৯৪৯

ভট্টাচার্য্য সন্স্ লিমিটেডের পক্ষে ১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও সবিতা প্রেসে ১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত

খুন্-থাইয়ের দেশ

খুন্ থাই মানে স্বাধীন মানুষ। এজন্য শ্যামরাজ্যের অপর নাম থাই-ল্যাণ্ড্ অর্থাৎ স্বাধীন দেশ। কেন এ নামটি দেওয়া হলো, শ্যামের যে কোন একটি গ্রাম দেখলেই, গ্রামবাসীর পারিবারিক জীবন-যাত্রা লক্ষ্য করলেই বুঝা যায়।

গ্রামের যে 'কামনান্' ও 'পূজাইবান্' নিয়ে পঞ্চায়েৎ, তাই কর্ত্তৃত্ব করে সকল ব্যাপারে প্রতি সন্ধ্যায় গ্রামবাসীদের নিয়ে সভা করে বসে। কামনান হলো আমাদের দেশের প্রসিডেণ্ট-পঞ্চায়েৎ আর পূজাইবান্ ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর আর কি! গ্রামবাসীর ভোটে এরা নির্ব্বাচিত হয়, তবে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকাল নাই, গ্রামবাসীর মনঃপূত না হলে যে কোন মুহূর্ত্তে তারা বাতিল হয়, নতুন নির্ব্বাচন চলে। আবার গ্রাম্য পঞ্চায়েতের আদেশ বা বিচারের ওপর হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা রাজারও নাই।

দ্বিতীয়, বিবাহকে কেন্দ্র করে কোন উৎসব-অনুষ্ঠান নাই, মন্ত্রপাঠ নাই, নাই পুরোহিতের প্রয়োজনীয়তা। পাত্র-পাত্রীর সম্মতি বা বাগ্‌দানই বিবাহ। পূর্ব্বকালে একে অন্যে স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করতে রাজি হয়ে চলে যেতো বনে, এখন যায় অন্য কোন স্থানে ইউরোপীয়ের মধু-চন্দ্র যাপনের মত।

তৃতীয়, জমির জন্য শ্যামবাসী রাজাকে কোন খাজনা বা কর দেয় না। তবে প্রতিশ্রুতি দিতে হয় যে প্রত্যেক প্রজা তিন বৎসরের খোরাকের পরিমাণ ফসল সর্ব্বদা ঘরে মজুত রাখবে। যেন অজন্মা বা ফসল নষ্ট হলে রাজার না আহার জোগাতে হয় প্রজাকে। এজন্য একটা নিয়ম বর্ত্তমান, রাজা আহারে বস্‌বার আগে মন্ত্রীকে প্রশ্ন করবেন—কেমন রাজ্যে কেউ তো অনাহারে নাই? উত্তর হবে—না, সবাই খেয়েছে।

কাজেই দেখ্‌তে পাওয়া যায় দেশে সবার ওপরে জনমতের প্রভাব, রাজাও তা মেনে নিতে বাধ্য। বাংলার 'রাজা গণেশ' ও 'দিব্য' সম্বন্ধে গবেষণার ফলে যে ইতিহাসের পর্য্যায় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, সেই গণতন্ত্রেরই যে প্রতিধ্বনি শ্যামদেশে এ ধারণা করা যেতে পারে। কারণ বহু পূর্ব্বকাল হতেই মগধরাজ্য ও তৎপরবর্ত্তী বঙ্গের সঙ্গে শ্যামের যোগাযোগ। সেকালের বাংলারই মত শ্যামের রাজা

প্রজাধিপককে সিংহাসন ত্যাগ করতে হয় জনমতের প্রভাবে—সে বেশি দিনের কথা নয়।

ভারতের নিবিড় স্পর্শ দেখা যায় শ্যামের ভাষায়, পরিচ্ছদে ও ধর্ম্মে। ভাষা ছিল দীর্ঘকাল প্রাকৃত (সংস্কৃত) বা পালি, ব্রাহ্মী লিপি ছিল প্রবর্ত্তিত, পরে অবশ্য মিশ্রণ হয়ে শ্যামভাষা দেখা দিয়েছে। তবু খাঁটি সংস্কৃত শব্দও তাতে রয়েছে, কাজেই কেউ যদি সংস্কৃত-মূলক বিশুদ্ধ বাংলা ব্যবহার করে তা শ্যামবাসী সহজে বোঝে।

পরিচ্ছদ তো উত্তর মালয়ের কেডারাজ্য (যা একদিন শ্যামের অন্তর্গত ছিল) থেকে যে ধুতি-পরার রেওয়াজ শ্যামেও তা-ই। মেয়েরা পরে শাড়ি কাছা দিয়ে মারাঠীদের মত। হালে পা-জামা ও ইউরোপীয় পোষাক ঢুকেছে। মেয়েরা কেউ কেউ পেটিকোটও পরে।

শ্যামবাসী সবাই বৌদ্ধ। আজ খৃষ্টানও দেখা যায়। সন্ন্যাসীর সংখ্যা এত যে শ্যামকে বৌদ্ধ-ভিক্ষুর দেশ বল্লেও অসঙ্গত হয় না। তার একটি কারণ, প্রত্যেক শ্যামবাসী নর-নারী জীবনে একবার অন্ততঃ গৈরিক ধারণ করে মঠে যেয়ে কিছুদিন বাস করবে। আবার ইচ্ছা হলেই গৈরিক ত্যাগ করে শাদা পোষাক পরে সংসারে ফিরে আস্বে। নারী সন্ন্যাসিনী হবার সময় রঙ্গিন শাড়ি ছেড়ে থান পরে মঠে যায়, আবার রঙ্গিন শাড়ি পরে ফিরে সংসারে ঢোকে।

অহিংসা সেখানে আনুষ্ঠানিক, অন্তরের জিনিষ নয়। তাই রাজা থেকে সুরু করে সাধারণ প্রজা পর্য্যন্ত সকল প্রকার মাছ-মাংসই খায়, মায় সাপের মাংসও। কিন্তু নিজ হাতে জীব-হিংসা করবে না। সেজন্য এখন চীনা কসাই আছে, আগে ছিল প্রতি গ্রামে একটি করে মুসলমান পরিবার বিদেশ হতে আনীত। সে করতো নাপিত আর কসাইয়ের কাজ। শ্যামেরা তার মেয়েদের বিবাহ করতো, কিন্তু নিজ মেয়ে মুসলমানের কাছে বিয়ে দিত না।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের বন্ধন শুধু এখানেই শিথিল নয়, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের স্পর্শেও সে ধর্ম্মের কোন গ্লানি হয় না। তাই রামায়ণের আদর্শ তাদের অস্থি-মজ্জাগত। অযোধ্যার রাজসভায় ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের মত শ্যামরাজ-সভায় একটি ব্রাহ্মণ আসীন বংশপরম্পরা। তিনি বৎসরে একদিন স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। সে দিন রাজা সাধারণ প্রজায় পর্য্যবসিত। তদুপরি রাজ্যের কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডাদেশ দিবার অধিকারী একমাত্র ব্রাহ্মণটি। রাজা তো অহিংসার পূজারী।

তিন

রামায়ণের প্রভাব এখানেই শেষ নয়। শ্যামদের প্রতি গ্রামে থাকে পুতুল নাচ দেখাবার দল। তারা রাম-সীতার কাহিনী ভিন্ন অন্য কিছু দেখায় না। ওদের নাটক অভিনয়, রাজপ্রাসাদে যে চারণদের গান, তারও বিষয় বস্তু—রামায়ণ। তাতেও বৌদ্ধ ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হয় না। যেমন হয় না মদ্যপানে।

থাইরা গৈরিক বস্ত্র ব্যাপারে ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে। অনেক সময় অপরাধীরা গৈরিক ধারণ করে সাজা এড়াতে চায়। সে ক্ষেত্রে পুলিশ তার গৈরিক ছাড়িয়ে শাদা পোষাক পরিয়ে তবে গ্রেপ্তার করে। গৈরিকের অবমাননা করে না। সৈনিকের কার্য্য হতে পলায়ন ও কারও স্বাধীনতা হরণ সে দেশে অমার্জ্জনীয় অপরাধ, তাদের বিচার ও শাস্তি প্রাণদণ্ড, দান করে জনগণ, রাজাও তা মকুব কর্‌তে পারেন না।

সরকারের আইনে জীবহত্যা নিষিদ্ধ। কিন্তু জনগণের আগ্রহে প্রতিপ্রসব সৃষ্টি হয়েছে আহারের জন্য প্রাণি-বধে রাজ-সরকারে কর দিলেই চলবে। সে ট্যাক্স প্রাণীর আকার হিসাবে পাঁচ, দশ কি পঁচিশ ডলার। কাজেই রাজস্ব রহিত হলেও প্রাণি-বধ থেকে সরকারের আয় অনেক বেশি।

বিবাহ-বিচ্ছেদ নাই সে দেশে, জাতি-বিচারও নাই। কিন্তু বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে হলে স্বামী বা স্ত্রী সন্ন্যাস গ্রহণ করে, আবার কিছুদিন পরে মঠ ত্যাগ করে এসে নতুন স্বামী বা স্ত্রী গ্রহণ করে সংসারী হয়। পরিত্যক্ত স্বামী বা স্ত্রীও নতুন করে বিয়ে কর্‌তে পারে।

অতিথির সমাদর সে দেশে আছে। তবে অতিথি-দেবতাকে নিজ বাস ভবনে আশ্রয় বা খাদ্য দেওয়া হয় না কলুষ-স্পর্শের ভয়ে, দেওয়া হয় মঠে-মন্দিরে বা লজিং হাউসে। তবে অনেক স্থলেই চায়ের বদলে সাম্‌সু মদ্য দিয়ে অতিথির সম্বর্দ্ধনা করা হয়।

শ্যামদেশের টাকার নাম টিকেল, চীনারা বলে ব্যাট্, ইউরোপীয়েরা বলে ডলার। একশত সেণ্টে এক টিকেল, দশ, কুড়ি ও পঞ্চাশ সেণ্টের মুদ্রা আছে। টিকেল মুদ্রা অপেক্ষা নোটই চল্‌তি বেশি। সেজন্য ওরা চামড়া বা বেতের তৈরি ম্যানিব্যাগ ব্যবহার করে। কিন্তু সাধারণে ব্যবহার করে বটুয়া, তাতে পান সুপারি থেকে সুরু করে কাগজ নোট সবই স্থান পায়।

থাইরা স্বাধীন। রাইফেল পিস্তল তলোয়ার প্রতি ঘরে, সেজন্য কোন লাইসেন্স বা অনুমতি নিতে হয় না সরকারের। তবে কথা হলো অহিংসার

দেশে ও-সব অস্ত্র কি কাজে লাগে? বাড়িতে একটা সাপ ঢুকলেও তারা নিজেরা মারে না, কসাইকে ডাকে। কিন্তু বেগতিকে পড়্‌লে থাই নারী পিস্তলের গুলীতে সাপ মারে। আবার অস্ত্রগুলা ব্যবহার হয় মানুষে-মানুষে মারামারিতে, সে স্থলে কিম্বা মৎস্য শিকারে অস্ত্র ব্যবহার দ্বারা তাদের অহিংসা-ধর্ম্ম ম্লান হয় না।

অথচ দুধ তারা খায় না। দুধে অধিকার গো-বৎসের। তাকে বঞ্চিত করা জীব-হিংসার সামিল। সেজন্য সেদেশে শিশুকে খাওয়ানো হয় তরল ফেন-ভাত।

থাইদের যেমন মদ্যপানে রুচি, তেমনি সর্ব্বদা খাবে পান। তবু খিলিপান বিক্রির দোকান নাই। কেউ খিলিপান কিনে খায় না, গোপন বিষদানের ভয়ে।

সম্প্রতি শ্যামের রাজধানী ব্যাঙ্ককের লোকসংখ্যা বেড়ে গেছে, বিশেষ করে বৈদেশিক আগমনে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হতে একে শ্বেতের খাস মহল বলা চলে। চীনের সাংহাই শহর যেমন আন্তর্জ্জাতিক এলাকা, কতকটা তেমনি যেন। যুদ্ধের সময় জাপান করেছিল শ্যামের পূর্ব্বাংশ জবর-দখল। জাপান বিতাড়িত হয়েছে, কিন্তু আমেরিকা যে গোপন ঘাঁটি তৈরি করেছিল শ্যামের সাহায্যের জন্য তা রয়েই গেছে। অষ্ট্রেলিয়া ও ব্রিটেন খনি ও রেলওয়ের সর্ব্বনিয়ন্তা, আজ আমেরিকার পরিচালনে তাদের চিরাচরিত শোষণ নীতি সেখানে অপ্রতিহত। ব্যাপার দেখে মনে হয়, যদি চীন থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের অপসরণ আবশ্যক হয়, তা হলে ব্যাঙ্কক হবে তাদের বাণিজ্যিক এক প্রধান কেন্দ্র।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি থাইরাজ্য ভ্রমণ শেষ করি। কাজেই পরাধীন ভারতের উল্লেখই প্রসঙ্গক্রমে করা হয়েছে।

সর্ব্ব-স্বাধীন শ্যাম

থাইরাজ্যে প্রথম 'নমস্কান্'

অহিংসার অভিচার

(নো-ম্যান্'স্ ল্যাণ্ড্—তিঙ্গি—কাষ্টম্স ঘাঁটি—বান্ সেধো—পাডাং বুসার্)

'চাক্কা গাড্ডীকী আসোয়ার !'

সামরিক কুচ-কাওয়াজের আদেশের মত গর্জ্জন।

আকস্মিকতার আঘাতে কাং হয়ে পড়ে গেলাম। কোন রকমে টাল সামলাতে সাইকেল হলো হাতছাড়া। মালিকহীন রথটি আমার নিরঙ্কুশ হয়ে পথ ছেড়ে অভদ্রের মত বেপথে চল্‌লো। অতি কষ্টে তার বিদ্রোহ দমন করে আবার পথে এসে চারদিকে তাকাই। কোথাও জন-মানব নাই!

ব্যাপারটা যেন নেহাৎই ভৌতিক। মহাশূন্যের নিস্তব্ধতা করেছে কুহক-জাল বিস্তার। একটু থেমেই আবার সাইকেলে উঠ্‌তে যাবো—আবার সে জলদ-গম্ভীর স্বরের রেশ—'দেবী মা-ঈ কালীজী' !

ভরাটে দরাজ গলা—সারা ভুবন গম্ গম্...

একবার মাত্র উচ্চারিত সে আহ্বান পর্ব্বতের গায়ে গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে শতধা বিদীর্ণ করলো শ্রবণকে।

এযে নিছক ভারতের মায়া। শব্দ অনুসরণ করে চোখ আমার ঘুরে বেড়ায়—কোথায় আহ্বানের নায়ক ? ঝোপ-ঝাড় ছাড়া কিছুই মালুম হয় না। আকাশ-বাণী নাকি ? গা ছম্-ছম্ করে ওঠে। হঠাৎ চোখে পড়ে ধোঁয়া—মস্ত বড় একটা ঝোপের আড়াল থেকে উঠ্‌ছে। হদিস্ ওখানে মিল্‌বে। গেলাম এগিয়ে।...

... ...

মলয় দেশের শেষপ্রান্তে হিন্দুস্থান রিপাব্‌লিকান্ এসোসিয়েশনের সর্ব্বশেষ দলের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এসেছি উত্তর মুখে অনেকটা দূর। মলয়ের

অত্যাগসহ নিদর্শন কেলাপ্পা-সারি (নারিকেল গাছের সারি) পেছনে ফেল্‌তেই য়্যাশ্‌ফাল্‌ট দেওয়া পথ খতম্‌—কাঁকরের রাস্তা দাঁত বার করে ভ্রূকুটি দিয়ে স্বাগতম্‌ জানালো—হিংস্র জন্তুর মুখোশ পরে।

বুঝলাম এটা 'নো-ম্যান্'স্‌ ল্যাণ্ড্' অর্থাৎ প্রভু-হারা দেশ। সাত মাইল চওড়া অনামা এ-অনুচ্ছেদটি পার হলে পাবো সর্ব্ব-স্বাধীন শ্যামের সাক্ষাৎকার। কারণ 'না-ম্যান্'স্‌ ল্যাণ্ড্' মলয়েরও নয়, শ্যামেরও নয়।

দেশ বলে দাবী এর কেউ করে না স্বীকার, কেননা এটা হলো জীবজন্তু আর পলাতক আসামীর রাজত্ব—যারা আইন মানে না, যারা সমাজ-বন্ধনের ক্রীতদাস নয়। উভয় সরকারই কিন্তু রাইফেল-বন্দুক নিয়ে দলে-বলে জুটে একবার করে ঢুঁ মারে এ তল্লাটে আর যাকে পায় তাকেই ধরে নিয়ে যায়। মলয় সরকার দেয় তাদের রাইফেলের মুখে ছুটি। কিন্তু শ্যামরাজ এদের দেহকে করে না হত্যা, ব্যক্তিত্বেরই ঘটায় অপঘাত।

কারণ এদের রাজনৈতিক উন্মাদ মনে করে ছেড়ে দেয় নিয়ে পাহাড়-ঘেরা উপত্যকায়, যার নাম লাং সোয়ান, প্রায় আটশ' মাইল উত্তরে। সেখানে তাদের শ্যাম-রমণী বিবাহ করে জীবন যাপন ছাড়া উপায় থাকে না। দেখেছি সেখানে রয়েছে চীনা, জাপানী, ইণ্ডিয়ান্‌, ইতালিয়ান্‌, জার্ম্মান্‌। তারা যেন জীবন্মৃত—মুঘল যুগে আগ্রার অন্দরমহলে খোজা রক্ষীর মত তিক্ততায় ভরপুর-প্রাণ।

সীমান্ত অতিক্রম করলাম পর্ব্বত-কাননে ঝিল্লীরবের মাঝে। আমার প্রাণের ভিতরও সারাক্ষণ ঝিঁ-ঝিঁ ডাক। বৃক্ষপত্রের আকুল দীর্ঘশ্বাসেও ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ঝুম্‌ঝুমি। জন-মানুষ নাই। থাক্‌লেও বুঝি তার মুখেও শোনা যেতো ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ। ঝিল্লীরব বিশ্ব-নীরবতা ভেদ করে আকাশ-বাতাসকে স্পন্দিত করে তুলেছে। ঝিল্লী যেন আমার মগজে ঢুকে খুলে খাচ্ছে। একটা কি কাকও নাই এ ভুবনে—নেহাৎ একটা চড়াই পাখী—

'চাক্কা গাড্ডীকী আসোয়ার !'······

'দেবী মা-ঈ কালীজী !'·········

ঝোপের আড়ালে ধোঁয়া·········

চমকিত অন্তরে শব্দ লক্ষ্য করে সাইকেল হাতে হচ্ছি অগ্রসর। ধ্বনির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। আর একটু এগোতেই শিহরণ খেলে শিরায় শিরায়—সিঙ্গাপুরের রামসিঙ্গা নাকি ! ('মলয়োশয়া ভ্রমণ' দেখুন)—না, ক্ষয়রোগীর

শীর্ণ মুখ এ নয়, তবে পরিচ্ছদ হুবহু সেই রক্তরাঙ্গা আলখাল্লা! চোখে পড়তেই আবার স্পন্দনমুখর স্বর—কালীজী!

—কাঁহে ফুকারা মহারাজজী?

—বেইঠো জী বেইঠো। যাতা হ্যায় কিধার্?

বসলাম না, নতিও জানালাম না। মন আমার বল্‌ছে আলখাল্লাটা ধোঁকার টাটি, গায়ে-মাখা ছাই-পাঁশ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের রক্তচক্ষুর দান। ভেবে চিন্তে জবাব দিলাম—

—যাবো ব্যাংকক। তবে ঠাকুর, পথে তোমার মত সৃষ্টিছাড়ার দর্শন ভাল কথা নয়। আমি চাই, অপরাজেয়দের আওতা এড়িয়ে চল্‌তে।

—ওঃ তোম্ হ্যায় বাঙ্গালী! বাৎকী স্থহেলী, বাৎ আউর্ বাৎ, দুসরা কুছ্ সিখা নহী।

—আমাকে ও জিনিষটি দু' বছর বয়স অবধি শিখিয়েই মা চোখ বুজেছেন। ফুরসৎ কই আর কিছু শেখবার?

—কাঁহে, এতনা ইস্কুল-কালিজ···

—বাইরে থেকে দেখেছি, ভিতরে ঢুকবার দোর ছিল বন্ধ। গুড্ বাই দোস্ত্···

—গড্ বি উইথ্ ইউ, কালীজী!

পেছন ফিরে ছুটে বেরিয়ে এলাম পথে। ঘনশ্বাস দেখা দিল। আর যাচ্ছি নে হিন্দুস্থান রিপাবলিকানদের মাঝে।

সাইকেল চালাতে চেষ্টা করছি দ্রুত, কিন্তু রাস্তা ক্রমশঃই খারাপ। এ পথে কেউ পথিক হয়, সেটা বোধ হয় রাস্তারও অভিপ্রেত নয়, মালিকের তো পাত্তাই নাই। রাস্তার অবস্থা জীর্ণপ্রায়, তাতে আবার অনধিকার প্রবেশ করেছে বেপরোয়া বৃক্ষরাজি আর উদ্ধত ঝোপ-ঝাড়গুলা। আর ছ'মাস পরে রাস্তাটা তার সত্তা হারিয়ে ফেল্‌বে দ্রুত বাড়ন্ত শ্যাম-বনানীর কাছে।

আধ মাইলটাক চড়াই ঠেলে পেলাম তিঙ্গি গ্রাম। তিঙ্গি মানে তুঙ্গ অর্থাৎ উঁচু। পাহাড়ের শিরে কি না। দাঁড়ালাম পল্লীর প্রবেশ-পথে, নীচের টিলাগুলা যেন ঢিবি, গাছগুলা যেন তুলসী চারা। ডান দিকে মনে হলো শ্যাম উপসাগরের নীল জলে ডুব দিয়ে দক্ষিণা হাওয়া উঠে এসে আমায় করছে আলিঙ্গন। সময়ে এমন জোরেই ধাক্কা দিচ্ছে যে মনে হয় আমায় উড়িয়ে নিয়ে আছড়ে ফেলবে

বঙ্গোপসাগর পার করে বাংলার উপকূলে। বাঁ দিক থেকে মলয়-সীমান্তের খড়কে কাঠির মত কেলাগ্গা-সারি মাথার পাগ্‌ড়ি কাঁপিয়ে জানাচ্ছে—ফিরে এস বন্ধু, আমরা প্রতীক্ষায় আছি।

গ্রামের চারপাশে প্রকৃতি নিজ হাতে রচনা করে রেখেছে বাগান—বুনো আম, বুনো কাঁঠাল আর গর্জ্জন গাছ দিয়ে। তার পর চারদিকেই শুধু পাহাড়-চূড়ার পর পাহাড়-চূড়া।

ওপরে তাকালাম—মেঘমালার শুভ্র চাঁদোয়া, পরতে পরতে সরে যাচ্ছে নবাগতের স্থান করে দিতে। এত নীচুতে নেমে এসেছে যে, হাত বাড়ালে যেন আঙ্গুলের ডগা ভিজে যাবে মেঘ-স্পর্শে। বিন্দু বিন্দু শিশিরের মত বৃক্ষের পাতায় পাতায় টলটলায়মান, আমার মাথার টুপীর ওপরও।

পল্লীতে ঢুকলাম, তাকে পল্লী না বললেও চলে। এখানে ওখানে একখানা দু'খানা করে ঘর চারপাশের গাছ-গাছড়ার মতই যেন মাটি ফুঁড়ে আপনি গজিয়েছে। গৃহস্বামী তাদেরও নিরুদ্দেশ। নো-ম্যান্‌'স্‌ ল্যাণ্ড্‌ কিনা, ছোঁয়াচ লেগেছে। হবে না কেন বলুন, একদল ডান্‌পিটে এসে ডেরা বাঁধলো, আরেক দল তার চেয়েও বেশি ডান্‌পিটে হয়ে মেরে ধরে তাড়িয়ে দিল তাদের। অবশেষে সরকারী পল্টন এসে এদেরও কর্‌লো পাকড়াও। ঘর বেচারিরা আর মালিক খুঁজে পায় না।

দৃশ্যের মোহে এ স্বর্গরাজ্যে যারা আস্তানা গাড়ে তাদের জীবন বন্যপশুর মতই একটানা লড়াই-ভরা। লড়াইয়ে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত। তাই এ রাজ্যে স্থায়ী বাসিন্দা থাকে না—হত্যা, লুণ্ঠন, বিতাড়নের বহরে।

ডাইনে-বাঁয়ে ছড়ানো হাঁড়ি, কড়া, ড্রাম, মগ, বোতল, টিন কৌটা। সবই ধাতুজ, মাটির নয়। লড়ায়ের স্মৃতি বুকে করে এরা যেন বিজ্ঞাপন দিয়েছে—নির্ব্বোধ মানুষ, এ মায়া রাজ্যে এসো না, আমাদের মত ইজ্জত হারিয়ে ধূলোয় গড়াগড়ি খাবে, ঝড়ো হাওয়ায় হবে নাকাল।

ভেবে দেখলাম, শ্যামের পাহাড়ে যারা বাস করে তারা বাঁশের চোঙ্গ ছাড়া আর কিছু ব্যবহার কর্‌তে জানে না। আর সমতল ভূমিতে যারা থাকে তারা ব্যবহার করে ধাতু-পাত্র। মাটির হাঁড়ি-কুড়ি এদের যেন অজানিত। এক ধাপ ডিঙ্গিয়ে সভ্যতায় চাক্‌চিক্যময় হয়েছে।

মলয়ের উত্তরাংশ থেকেই শ্যাম এলাকা। সেটাও মলয়ের মতই অপ্রশস্ত ভূভাগ। তাই উত্তরে চল্‌লেও আমায় পর্য্যায়ক্রমে একবার পূব তীরে, আর

একবার পশ্চিম তীর ঘেঁসে চলতে হয়েছে। পূবতীরে নৌকায়ও যেতে হয়েছে কিছুটা।

আর মায়া বাড়িয়ে লাভ নাই। বিপ্লবীদলের সঙ্গ অপেক্ষাও এ ঠাঁই ভয়াল। চল্‌লাম উত্তর-মুখো। রাস্তা ক্রমেই যেন প্রশস্ত, যেন পরিষ্কার। মনের মেঘ কেটে গেল।

কিছুটা উৎরাই পথ ঘাড়ে ধরে ঠেলে নিয়ে এল কাষ্টমস ঘাঁটিতে। ঘাঁটিতে থামতে হলো। অফিসার আমার পাসপোর্ট দেখলেন, তারপর তিনখানা কাগজ তৈরি করে আমায় একখানা দিলেন। বল্‌লেন—

ব্যাংককে পৌঁছে এ কাগজখানা সেখানকার কাষ্টমস অফিসে জমা দেবেন। তিনি আপনার সকল অসুবিধা দূর কর্‌বেন। শ্যামদেশ সব রকমে স্বাধীন, যা দুনিয়ার আর কোথাও দেখ্‌তে পাবেন না। তাতে ভয়ের কিছু নেই।

যো হুকুম। এর আর জবাব দেব কি, আগে দেখি স্বাধীনতার বুনট কতটা খাপী। কথা চালাতে হয়েছিল ইংরেজী ভাষায়। আর ফরাসী ভাষাও এরা অনেকেই শেখে।—মলয় ভাষা শেখেন্ না কেন ?

—তা কি করে হবে। ইংরেজ আর ফরাসী এ দেশে এসে ভাষা দুটো আমাদের ঘাড়ে চাপিয়েছে। কই মলয়রা তো কস্মিন্‌কালেও এ দেশে আসে না ভদ্র বেশে! যারা আসে তাদের সাধ্য নেই ভাষার মোহে বিদেশীকে মোহিত করে। তা ছাড়া মলয় হলো বারোয়ারি ভাষা, যার কোন সাহিত্যের ছোঁয়া নেই, ঠিক যেন বুনো অসভ্যদের বুলি, ইসারার বদলে কোন রকমে কাজ চালানো আর কি।

বিদায় নিয়ে এলাম। ঘাঁটির পেছনে দেখলাম বাংলো ধরণের ঘর। কাষ্টমস অফিসারের কোয়ার্টার। স্ত্রী-পুত্র রয়েছে। আবার সহকারী, রক্ষী, পরিচারক—সবই আছে। ভড়ং তো কম নয়।

রাস্তায় চলেছি, মাথায় খেল্‌ছে অফিসারের মুখের 'সব রকমে স্বাধীন' কথাটা। স্বাধীনতার আবার ডিগ্রি আছে না কি, জরের টেম্পারেচারের (তাপের) মত ? দেখা যাক্।

আড়াই মাইল ধরে স্বাধীনতার শ্রাদ্ধ করে অবশেষে পেলাম বান্ সেধো। বান্ মানে ঘর, সেধো হলো সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থের ঘরের মুখপাত যা দেখলাম তাতে নাকে রুমাল ধর্‌তে হলো। পথের দুদিকে চীনারা করেছে শূকরের

বাথান। দুর্গন্ধে নাক জলে যায়। তারপর আবার গোলাবাড়ি—হাঁস মুরগী ছাগল ভেড়া সব কিছু পালনের। নইলে নিত্য মাংস আহার চল্‌বে কি করে! তার গন্ধও কি কম। তবে সেগুলা গায়ে গায়ে নয়—অনেকটা দূরে দূরে।

গ্রামে ঢুকেই নজরে পড়লো এখানে ওখানে স্তূপাকার কাঠকয়লা। বুঝলাম গ্রামটা নতুন পত্তন করা হয়েছে—বন কেটে। আর তার অনাবশ্যক গাছ-গাছড়া হয়েছে পোড়ানো।

ঘরগুলা মলয়-পল্লীর মত ছ'-সাত হাত উঁচু মাচার ওপরে নয়। আমাদের দেশের ঘরের মতই, তবে চালে করোগেট নয়—পাতার ছাউনি, মেঝে মাটির না হয় কাঠের। কাঠের মেঝে হয় যে-তল্লাটে বানের জলে প্লাবন হয়। না হলে সবই মাটির মেঝে। আবার বন-অঞ্চলে হয় উঁচু মাচার ওপর ঘর মলয় দেশের মত। এ গ্রামে শুধু মাটির মেঝে। আর ঘর তৈরিতে কেবল কাঠ আর কাঠ। মায় দাওয়ায় ওঠবার সিঁড়ি অবধি কাঠের।

আবার গ্রামখানি গড়ে তোলবার আগে যেন শহুরে কায়দায় নক্সা করে নেওয়া হয়েছে। গ্রামের ঠিক মাঝখান দিয়ে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে বড় রাস্তা পল্লীগুলাকে দু'ভাগ করেছে। ঠিক যেন সীমন্ত-সিঁথি, আর সোজা সরলরেখার পথদেহ ঠেকেছে এসে গ্রামের বৌদ্ধ-মঠটিতে। এ শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম হবার যো নাই, সমাজ-নিয়ম এমনই দৃঢ়-বদ্ধ।

আমি গ্রামে ঢুকতেই একটি লোক এগিয়ে এসে ডেকে নিল কামনান অর্থাৎ মোড়লের বাড়ি। ভেবেছিলাম সেখানেই আশ্রয় পাবো। কিন্তু আস্তানা হলো বৌদ্ধ মঠটির একটা পরিত্যক্ত প্রকোষ্ঠে। আমার তা আদপেই ভালো লাগলো না।

কামনান অজুহাতে জানালেন—অতিথি-দেবতাকে আমাদের মলিন স্পর্শে কি কলুষিত করতে পারি? তাই স্থান দেই মঠে-প্যাগোদায়।

আমি আর বৃথা বাক্য ব্যয় না করে গেলাম লজিং হাউসে। কামনানের সহকারী পঞ্চায়েৎ চার জন (যাদের বলা হয় পূজাই বান্) এসে আমায় জানালে দু' দিন এখানে বাসের সকল ব্যয় (এক টিকেল) গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ-সভার তরফ থেকে তারা জমা দিয়েছে লজিং হাউসে, আমি যেন কিছু ব্যয় না করি।

বিকাল বেলা গ্রাম ঘুরে দেখলাম। রাস্তায় কেবল সন্ন্যাসী, মনে হয় শ্যামের সব লোকই বুঝি বিবাগী। ঘুরতে ঘুরতে পুকুর নজরে পড়লো প্রতি পাড়ায়।

একটি আবার এত বড় আর জল তার এমনি টল টল করছে যে লোভ সামলানো গেল না। ঘাটে গিয়ে বেশ করে মুখ-হাত ধুয়ে এলাম, এক অঞ্জলি জলও পান করলাম। ঘাটের ধাপ শাণ-বাঁধানো নয়, সেখানেও কাঠেরই জয় জয়কার।

রুমাল দিয়ে মুখ পুঁছতে পুঁছতে মনে পড়লো সিঙ্গাপুরের শ্যাম-কন্সালের কথা। সে বলেছিল, মলয়দেশের মত শ্যামবাসীরা কেউ পুকুরে-জলায় মল-মূত্র ত্যাগ করে না। পুকুর তাদের অতি পরিচ্ছন্ন। সত্যই দেখলাম তাই। এ ব্যাপারে শ্যাম যেন বাংলা দেশ। তাই পুকুরের জল পানে কিন্তু করি নাই।

—নমস্কান্! নমস্কান্!

সন্ধ্যার পর কামনান্, পূজাই বান্ সকলে লজিং হাউসে এসে আমায় দেখামাত্র জোড়হাতে সম্ভাষণ জানালেন—নমস্কান্! নমস্কান্ !

আমি বল্‌লাম—নমস্কার!

তা ওরা লক্ষ্য করলো কি-না জানি না। তবে নমস্কান্ তো সংস্কৃত নমস্ শব্দ থেকেই পালি আকার ধরেছে নমস্কারের। তা ছাড়া আর কি হতে পারে!

নমস্কান্ দিয়ে অভ্যাগতের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করলেও আমায় তারা সন্দেহের চোখেই দেখ্‌ছিল, যেমন সকল বিদেশীকেই তারা দেখে থাকে। তবু কিন্তু আমায় আপ্যায়িত করতে হাজির করলো সাম্‌সু মদ্য। আমাদের দেশের 'চা' এক কাপ দিয়ে ভদ্র রীতি বহাল আর কি!

এক চুমুক খেয়ে বুঝলাম ওটা ধেনো মদ। আর খেলাম না। তারাও আর অনুরোধ করে নাই আমার অনিচ্ছা দেখে। আমিই অনুরোধ জানালাম পাল্টা তাদের মদ্য পান করতে, আর গ্লাসে ঢেলে ঢেলে তাদের হাতে দিলাম।

মদ্যপান করেও কামনান্ বৈশিষ্ট্য হারালেন না। পূজাই বান্‌রাও বেফাঁস কিছু বলে ফেলে নাই। কামনান্ তো শ্বেত-বিদেশীর বিরুদ্ধে শ্যামের অভিযোগ কাহিনী বল্‌তে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন।—

—ব্রিটিশরা নিয়েছে দক্ষিণ থেকে মলয় দেশটা কেড়ে, নইলে ত্রেঙ্গানু, কেডা, কেলেন্তান, পারলিস্ তো হালে নিয়ে জুড়ে দিয়েছে মলয়ে। উত্তরে ব্রহ্মদেশটা নিয়েছে, আবার টেনাসেরিম প্রদেশটা নিয়েছে বল্‌তে গেলে সেদিন। পূবদিকে ফরাসীরা নিয়েছে কম্বোজ আর লেয়োস। আসল সীমানা আমাদের ছিল উত্তরে চীন, দক্ষিণে সিঙ্গাপুর, পশ্চিমে শালবিন নদী, পূবে মেকং নদী।

বলুন তো এটা দুঃখের বিষয় নয় কি যে, আমাদের শ্যাম-ভাষাভাষী স্বাধীন ভাইয়েরা ছিনিয়ে-নেওয়া দেশগুলাতে বিদেশীদের অধীন।

কামনানের বিদ্যা-বুদ্ধি দেখে বিস্ময় লাগলো। স্বাধীন দেশের লোক বুঝি এমনি হয়। এ-ই হলো আমার প্রথম স্বাধীন দেশ দর্শন। মনে একটা শ্রদ্ধা জাগ্‌লো শ্যামবাসীর প্রতি।

আরো চমক লেগেছিল পরের দিন এক আফিংখোরের কথায়।—

—আমরা হচ্ছি একতাল ন্যাচ্‌পেচে রবার, চারদিক থেকে ঠেল্‌ছে আর আমরা টোল খেয়ে ভেতরে ঢুকছি। শ্যামকে দুর্ব্বল পেয়ে বিদেশীরা কেবল চিলের মত ছোঁ মারতেই উদ্যত। ইংরেজ, ফরাসী ছাড়াও জাপানী, আমেরিকান —সবাই ওৎ পেতে আছে।

শ্যামের আফিংখোরও রাজনীতিক, পণ্ডিত লোক। দেশের গোপন কথাটি বল্‌বে না, বলে তাদের আশার কথা, অভিযোগের কথা।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি দলে দলে বৌদ্ধ ভিক্ষু, শ্রমণ প্রভৃতি গেরুয়া-ধারী সন্ন্যাসী বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করছে। তাদের দেওয়া হচ্ছে শুধু ভাত, আর কিছু নয়। লজিং হাউসের চীনা মালিক বল্‌লো যে, মঠে এদের জন্য শাক-সবজি রান্না হয়, ভাত হয় না; তাই এরা ভাত ভিক্ষা করে, খায়ও দিনে একবার মাত্র। রাতে খাবার নিয়ম নাই।

স্কুল একটা দেখলাম। একটাই তার ক্লাশ। গ্রাম্য শিক্ষক একজন সব বিষয় পড়ান। সেদিন যিনি পড়াচ্ছিলেন তিনি শিক্ষক নন, ইন্‌স্‌পেক্‌টর। এ অঞ্চলের তিনটে স্কুলে তাঁর সপ্তাহে দু দিন করে পড়াতে হয়। এ ব্যবস্থা নাকি সারা শ্যামদেশে।

—শুধু লেখাপড়া শেখানো আমাদের কাজ নয়। জীবন-পথের সব কিছুই আমরা শেখাই। নাগরিক অধিকার থেকে নাগরিকের কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত। এ শিক্ষা না দিলে কোন বিদেশী এ দেশে স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে পারতো না। ছেলে-বুড়ো সবাই মিলে তাকে অতিষ্ঠ করে তুল্‌তো। আজো মলয়ে ইন্দোচীনে কাঁচ-ভাঙ্গা, বেত কাঁটা দিয়ে বিদেশীকে ঘাল করা, তার সাইকেল ফুটো করা হয়। শ্যামদেশে সে সব নেই।

—আপনি স্কুল ইনস্পেক্‌টর্‌ হয়ে কর্‌ছেন শিক্ষকতা, অফিস চলে কি করে?

—সে কাজ তো সোজা, তা করে ডেপুটি ইনস্পেক্টরেরা। আমরা তো স্কুল নিয়েই আছি, কাজেই অফিসের কাজ গতানুগতিক।

—আপনাদের গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ সভা, শিক্ষা-পদ্ধতি সবেই দেখ্‌ছি সর্ব্ব-সাধারণের প্রভাব অশেষ সরকারী তদারকের চেয়ে।

—ক্রমে আরো দেখবেন পথে পথে। আমরা ব্রাউন মঙ্গোলিয়ান, আমরা দশজনে মিলে-মিশে বাস কর্‌তে, কাজ কর্‌তে জানি নে। সবে শিক্ষা পেতে সুরু করেছি, আর কিছুদিন পরে দেখবেন রাজাকেও মাথানত কর্‌তে হবে জনমতের কাছে।

স্কুলের সময় নষ্ট করা সঙ্গত নয়। 'নমস্কার' বলে বিদায় নিলাম। কিন্তু আমার 'নমস্কার' উচ্চারণে তিনি আশ্চর্য্য হলেন। যেন ক্ষমা-প্রার্থনার সুরে জানালেন সন্ধ্যায় এসে দেখা করবেন লজিং হাউসে।

রাস্তায় আবার সন্ন্যাসী গিস্‌ গিস্‌ কর্‌ছে। একটা গ্রামে এত সন্ন্যাসী। লজিং হাউসের চীনা ম্যানেজার বল্‌লো—এরা সবাই জীবনে একবার করে অন্ততঃ সন্ন্যাসী হয়। তারপর গৈরিক ছেড়ে চলে আসে সংসারে। সন্ন্যাসের গৌরব নেই, ফিরে এলেও অসম্মান নেই। মেয়েগুলাও সন্ন্যাসিনী হয় শাদা থান পরে, আবার রঙিন শাড়ি পরে হয় গৃহিণী।

সন্ধ্যায় গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ সভা দেখলাম। কামনান, পূজাইবান ছাড়া গ্রামবাসী অনেকে উপস্থিত ছিলেন, ইন্‌স্‌পেক্‌টরও বুঝি গ্রামের লোক, তিনিও ছিলেন। অন্য কোন আলোচ্য বিষয় বা চোর-ডাকাতের বিচার ছিল না সেদিন। আমার কথা, শ্যামের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা নিয়ে ভারতের তারিফ হলো। ভারত স্বাধীন হোক, মহাত্মা গান্ধী দীর্ঘজীবী হোন, অহিংস আন্দোলন দুনিয়া ছেয়ে যাক—এরকম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হলো।

সভাশেষে ইন্‌স্‌পেক্‌টর ও কামনান আমায় লজিং হাউসে পৌঁছে দিলেন। দু'জনেই ভিতরে এলেন। দেখলাম এরা সবাই ইন্‌স্‌পেক্‌টরকে সমীহ করে চলে। কোথায় কি খুঁত বেরিয়ে পড়ে সে ভয়ে কেউ ইন্‌স্‌পেক্‌টরের কথায় প্রতিবাদ করে না।

কথায় কথায় বুঝলাম ইন্‌স্‌পেক্‌টর উচ্চ শিক্ষিত, চারটে ভাষা তাঁর নখদর্পণে। আমার অনেক জিনিষ জানবার ছিল। একে একে জানতে চাইলাম।

—আপনারা 'মহাশয়' ব্যবহার না করে 'ন্যাই' বলেন কেন ?

—মহাশয় কথাটা আগেকার দিনে ব্যবহার হতো। কিন্তু ও-কথাটা সাধারণ লোককে বলা হতো না, শুধু হোমরা-চোমরাদের। আমরা যে সাম্য চাই তাতে মহাশয় কথাটা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো। জনগণ চাইলো এমন একটা কথা যা সকলকেই বলা চলে সমভাবে। রাজার নিকট আবেদন হলো। তিনি মত নিলেন রাজ দরবারে সর্ব্বোচ্চস্থানের অধিকারী ব্রাহ্মণের নিকট। তিনি বিধান দিলেন 'ন্যায়ী' বা 'ন্যাই' বলবার।

—আপনাদের বৌদ্ধ-ধর্ম্মে ব্রাহ্মণ মন্ত্রী কেন?

—ব্রাহ্মণ মন্ত্রী নন্। আপনাদের দেশের রামায়ণে যে বশিষ্ঠ দেখা যায় অযোধ্যার রাজারও ওপরে, কতকটা তেমনি। ব্রাহ্মণই হলেন এ রাজ্যের প্রকৃত মালিক। রাজা তো তাঁরই প্রতিনিধি হয়ে রাজ্য শাসন করেন। তাই বছরে একদিন ব্রাহ্মণ স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। সে দিন রাজা হন পলাতক, নইলে ব্রাহ্মণের আদেশে তাঁর প্রাণদণ্ডও হতে পারে কসুর পেলেই। এত বড় রাজ্যে কোথায় কি রাজ-কর্ত্তব্যে ত্রুটি হয় বলা যায় না তো।

—রাজবংশের লোককে কি রকম সম্মান দেখানো হয়?

—রাজা আর ভাবী উত্তরাধিকারী পান রাজকীয় সম্মান, আর কেউ নয়। রাজার ভাইয়েরা ওমরাহের মত, কিন্তু অন্য সব, এমন কি ভাইয়ের ছেলেও 'ন্যাই' সম্বোধন পায়। তাদের সাধারণের মতই খেটে খেতে হয়। সম্পত্তি বা ভাতা কিছুই পায় না।

—বিদেশী কেউ নাগরিক অধিকার পায় কি হলে?

—আপনি যদি শ্যামের মেয়ে বিয়ে করেও স্থায়ী বাসিন্দা হন তবু পাবেন না পৌর অধিকার। আপনার ছেলেমেয়েরাও হবে না থুন থাই (স্বাধীন মানুষ)। তাদের যে সন্তান সে পাবে শ্যামবাসীর সকল অধিকার। কেমন, ভাল নয় এ আইন?

—ভাল বই কি। আচ্ছা সকাল বেলা বিদায়কালে আমি 'নমস্কার' বললে আপনি আশ্চর্য্য হলেন কেন?

—সে অনেক কথা। সে কথা আপনাকে বল্তে এখন আর আমাদের আপত্তি নেই। প্রথমতঃ বিদেশীরা কেউ ওকথা বলে না, জানে না, বুঝে না ওর মর্ম্ম। আপনার দেশে তো সংস্কৃত এখনো অনেকে শেখে। ও-ভাষা থেকেই আমরা পেয়েছি পালি। আমাদের পুরাতন পুঁথি সবই পালি ভাষায়। পালি ভাষায়

নমস্কান্ (সংস্কৃত নমস্কার) মানে 'সমান হওয়া' সংস্কৃতে যাকে বলে 'সাযুজ্য'। কাজেই আপনার নমস্কার সম্ভাষণে বুঝ্‌লাম অন্য বিদেশীর মত আপনি সম্পর্কহীন উদাসী থাকতে চান না, চান 'সাযুজ্য'। তাই আজ আর আমাদের প্রাণের কথা আপনার কাছে গোপন করবার কোন হেতুই নেই বন্ধু অতিথি !

—আপনি ভারতের এত খবর রাখেন ? আমি তো ধারণাও করতে পারি নি সংস্কৃতের ব্যাখ্যা শুন্‌বো খুন্ থাইয়ের মুখে।

—ভারতের খবর রাখবো না, আমাদের সভ্যতা, আমাদের পরিচ্ছদ সবই তো ভারতের দান সেই সেকালে। আজ আমরা তারই ওপর দাঁড়িয়ে সারা বিশ্বের যা ভাল তাই গ্রহণ করছি। আচ্ছা আপনি কি বৌদ্ধ ?

—না, ভাই। আমার পরিবার ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের ভক্ত। তা হোক আমার দেশে লোকে ও-ধর্মকে বলে হিন্দু ধর্ম আর বৌদ্ধদেরও বলে হিন্দু, পৃথক মনে করে না। যেমন পৃথক মনে করে মুসলিম-খৃষ্টান প্রভৃতি কে।

রাত হয়েছে ঢের, তাঁরা বিদায় নিয়ে গেলেন। আবার নমস্কান্—নমস্কান্। সে আন্তরিকতার রেশ রাত্রি-শেষ অবধি আমায় স্পন্দিত করে রাখ্‌লো। ইন্‌স্‌পেক্‌টর যেন একাধারে অতীত ভারত আর বর্ত্তমান শ্যামের মিলনের মূর্ত্ত প্রতীক। অপরিসীম ব্যক্তিত্বে সে-ই যেন সর্ব্বনিয়ন্তা।

পরের দিন রওনা হলাম পাডাং বুসার প্রায় পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে। রাস্তায় বেরুতেই সন্ন্যাসীর দল। তারা কেউ কোন প্রশ্ন করে নাই, সাইকেল দেখেই বুঝেছে আমি বিদেশী ভ্রমণকারী।

একটি তরুণ সন্ন্যাসী বল্‌লে, Come with me (আমার সঙ্গে এস)। তার সঙ্গে একটা বাগানে গেলাম। একটা ছোট চারাগাছ শিকড় শুদ্ধ টেনে তুলে— তারই শিকড়টা আমার হাতে দিয়ে বললে—যে কোন সাপেই কামড়ায় না কেন, এ শিকড় চিবিয়ে খেলে সব বিষ জল হয়ে যাবে।

কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়, তাই ধন্যবাদ দিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি তো ভাই চিরদিন ভিক্ষু-জীবন কাটাতে গৈরিক ধর নি, কেমন ?

—তাতে কি ! যতক্ষণ মনে পবিত্রতা থাক্‌বে মঠে থাক্‌বো, সংসারের বাসনা এলে তা মনে পুষে গৈরিকের সম্ভ্রম-হানি করবো না। তখন গৃহী হব।

বিদায় নিয়ে পথ ধরলাম। গ্রাম ছাড়াবার পরই পথ নিরালা। আবার বন সুরু হলো। তবে রাস্তার দু'পাশে অনেক দূর অবধি গাছ-গাছড়া কেটে

ফলাও করা হয়েছে। একেবারে সরল রেখার পথ, কোথাও আঁকা-বাঁকা নাই। কিন্তু ডাইনে-বাঁয়ে একটু দূরে হলেও গভীর অরণ্য। বেলা সাড়ে বারোটার সময় পাড়াং বুসারে প্রবেশ কর্‌লাম।

শহরটি চীনা ধরণে প্রস্তুত, কারণ এখানে চীনার সংখ্যাই বেশি। মলয়দেশে যেমন চীনা-পল্লী দেখেছি হুবহু তেমনি। চীনা লজিং হাউসেই আশ্রয় নিলাম। দৈনিক ভাড়া এক ব্যাট্। সাইন-বোর্ডগুলা দেখে তাক্ লেগে গেল এজন্য যে তাতে শুধু শ্যামভাষায় লেখা নয়, শ্যাম ভাষা তো আছেই আর একপাশে চীনা ভাষায় লেখা, তবু রোমান অক্ষরে (ইংরেজী হরফে) কারবারের নামধাম রয়েছে।

শ্যামের প্রতি শহরেই এ রকম ব্যবস্থা। বহু ইউরোপীয় জাতি এদেশে আনাগোনা করে, আবার জাপানী ও আমেরিকানের সংখ্যাও কম নয়। তাদের সুবিধার জন্যই এ নিয়ম আজও রয়েছে সেদেশে। এত বিদেশী আসবার কারণ, এ শহর থেকে পূব উপকূল খুব বেশি দূরবর্ত্তী নয়। তবে রাস্তা রদ্দি।

কয়েকটি ভারতীয় ডাক্তার এখানে দেখলাম। বৃটিশের চাকরি নিয়ে কয়েকটি বাঙ্গালী ডাক্তারও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কৃপায় শ্যামদেশে গিয়েছিল, তারা সেখানে স্থায়ী বাসিন্দা হয় নাই, তার ভিতর আমার এক বন্ধু ছিল তার মুখে শুনেছি। কিন্তু পাডাং বুসারে যে ভারতীয় ডাক্তার কয়টি দেখে এসেছি, তারা নিশ্চয়ই শ্যামদেশের মায়া কাটাতে পারে নাই। সেদেশে বিবাহ করে শ্যামবাসী বনে গিয়েছে।

একজন ডাক্তারকেই দেখলাম একেবারে ফপরদালাল। তাঁর তো নাগরিক অধিকার নাই শ্যামে, তবু শ্যামবাসীর হয়ে আমায় আদর-আপ্যায়ন করলেন, শ্যামের না বদনাম রটাই হুঁশিয়ার করে দিলেন। আবার গায়ে পড়ে এসে যখন তখন শোনাতেন গল্প পাঞ্জাবের 'দোয়াব্ বিদ্রোহ' সম্বন্ধে। ডাক্তারকে ভাল লাগলেও তাঁর অবিরাম পাঞ্জাবী আবহাওয়া সৃষ্টির গল্প-স্রোত প্রাদেশিকতার বাগ্‌জালায় কেবলই কটু হয়ে উঠতো।

কিন্তু ডাক্তারের স্ত্রী হয়েছিল আমার গাইড্। শ্যামদেশে নারী থাই অর্থাৎ স্বাধীন। কেননা তারা স্বামীর উপার্জ্জনের ওপর নির্ভর করে না। যোগ্যতা অনুসারে শ্রমের কাজ করে—ক্ষেত-খামারের কাজ থেকে রাইফেল ঘাড়ে করে সৈনিক হওয়া অবধি।

ভারতের অনেক প্রদেশেই নারী শ্রমের কাজ করে, কিন্তু বন্দুক ঘাড়ে করতে দেখা যায় না। এ-কাজটা চীনা নারী যেমন করে থাই নারীও তেমনি করতে পছন্দ করে।

ডাক্তারের পত্নীর নাম সুপ্রভা। সে হাফ-কাষ্ট, পিতা ছিল চীনা, মা শ্যাম নারী। সুপ্রভা ফুকিন ভাষা বেশ বলতো, পিতা তার সে প্রদেশেরই লোক। নামও ছিল তার চীনা, কিন্তু ভারতীয় ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে হবার পর নাম হয় সুপ্রভা। ডাক্তার হিন্দু কি মুস্লিম তা জানতে পারি নাই। পোষাক-আষাকে তো নয়ই, চলন বলনেও না।

সুপ্রভা পরতো অনেক সময় ভারতীয় শাড়ি মারাঠী ধরণে, মাথায় ঘোমটা নয়, রুমাল বাঁধা মলয়-নারীর মত। শ্যামদেশে নারীর বব্ কাট্ই ফ্যাশান, কিন্তু সুপ্রভা মধ্যপন্থা নিয়েছিল, ভারত-নারীর লম্বা চুলও নয়, বব্ও নয়—মাঝামাঝি, কতকটা বাবরি ধরণের, দেখাতো বেশ সুন্দর।

পাডাং বুসার শহরটি সমতলভূমিতে, পূবদিকেও সমতলভূমি একেবারে সাগর-জল স্পর্শ করেছে। শ্যামের পশ্চিমে পাহাড় উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্ব, সেটা হিমালয়ের শেষ প্রান্তের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে এশিয়ার পূব অঞ্চলের পর্ব্বতমালার। তবে শুনেছি একটি মাত্র রাস্তা আছে পাহাড় ডিঙ্গোবার সেখানে সাইকেল চালানো সম্ভব।

শহরের পূবদিকের সমতল ক্ষেত্রেই যত রবার বাগান আর টিন খনি। শুনলাম শ্যামদেশে টিনের দাম রূপার দামের সমান। খনির কাজে ঢিমা পড়লে উত্তোলনের ঘাঁটতিতে সময়ে টিনের দাম রূপাকে ছাপিয়ে ওঠে। এত টিন, রূপা আর অপর খনিজ শ্যামে, এ খবরটা হয়তো সাম্রাজ্যবাদীরা আগে পায় নাই, তাই একে রেহাই দিয়ে স্বাধীন থাকতে দিয়েছে। তবে জনমতের যে অসামান্য প্রভাব সেজন্যও শ্বেতকায় এদেশে থাবা মারে নাই হয়তো।

রেল ষ্টেশন থেকে মাইলখানেক দূরেই টিন খনি আরম্ভ। টার্মিনাস ষ্টেশন, এখানেই ব্রিটিশের রেলপথ শেষ। সেজন্য ব্রিটিশ অফিসার বাস করে ঢের; তাদের কোয়ার্টার্স অনেকটা স্থান জুড়ে, সবই বাংলো ধরণের কাঠের ঘর।

সুপ্রভারও সাইকেল আছে। কাছা গুঁজে শাড়ি পরে সে বেশ চালাতো। দুজনে সেদিন বেরোলাম খনি দেখতে। গভীর খনিগুলায় চল্ছে ড্রেজার, আর যেখানে দু'তিন হাত মাটির নীচে টিন, সেগুলা উন্মুক্ত খনি (Open mine),

মজুররা ওপর থেকেই ট্রাঙ্গি চালাচ্ছে। খনির মালিক, ম্যানেজার সবই শ্বেতকায়।

মজুর বস্তী দেখলাম কয়েকটা। ঘরগুলা মন্দ নয়। তাদের আবার পৃথক পৃথক আস্তানা-গুচ্ছ (অর্থাৎ Zone বিভাগ)। প্রতিটিকে বলা হয় কংসি। কংসিতে একটি করে চীনা পরিচালক, কারণ মজুর অধিকাংশই চীনা। কংসির ব্যবস্থা কতকটা আমাদের দেশের মেস্-এর মত। সমবায়ী ব্যবস্থাই চীনা মজুরদের নিয়ম। দু'তিন জন মিলেও যে আলাদা রান্না করে খাবে এমন মেজাজ তাদের নয়। তারা সুপ্রভাকে ম্যাদাম বলে খুব শ্রদ্ধা দেখালো।

আমি চীনদেশে যাবো শুনে মজুরদের মুখে হাসিরেখা ফুটলো। পরিচালক ডেকে নিয়ে এল ছিং ছাং অর্থাৎ শিক্ষিত লোক। লম্বা পাতলা চেহারা, বেশ ভদ্র আদল তাঁর সর্ব্বাঙ্গে। আমায় দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন—

—দুনিয়ায় এত মজার দেশ থাকতে রিক্ত চীনদেশে যেতে চান কেন?

—দেশটা দেখা, দেশবাসীর সুখ-দুঃখের কথা শোনা।

—নদী-পাহাড় সব দেশেই আছে, চীনাদের বুলি এখানে বসেই তো শুন্তে পান, তবে?

—দেখুন, লোকে তীর্থ-ভ্রমণ করে কত কষ্ট করে, আমি করি ভ্রমণ তীর্থের জন্য নয়, জ্ঞানলাভের জন্য। ভ্রমণ না করলে জীবন অপূর্ণ থাকে বলে। বিশেষ করে আমার দেশের লোক ঘরের বার হয় না, সে বদনাম ঘুচাব বলে।

—আপনি নাম কিন্তে চান!

—না, না। নাম দিয়ে আমার কোন দরকার নাই। ভিক্ষা করে যে দেশ ভ্রমণ করে সে নামের কাঙ্গাল নয়, সে শুধু নতুন দেশ দেখে, নতুন মানুষের হাসি-কান্না শুনে জীবন সার্থক করে। আর কিছু নয়।

—যান্ তবে, দেখে আসুন্ ক্ষত-বিক্ষত চীন, শুনে আসুন চীনের আর্ত্তনাদ, আর চতুর সংবাদপত্র-সেবীদের খপ্পরে পড়ে চীনের বুকে বসে 'চীনা-ডাকাত'দের অপযশ গান করে আসুন, যা সব ভ্রমণকারীই করে থাকে।

বলেই ভদ্রলোক চলে গেলেন। চীনে গেলে কোন ভয় নাই, একথা সব চীনাই বলে, এ ভদ্রলোক সে রকম বল্লে না কেন?

সুপ্রভা জানতে চাইলো আমি কি ভাবছি।

রাস্তায় এসে তাকে বল্‌লাম, লোকটার অসহযোগের মনোবৃত্তির কথা।

—এ লোকটি আমার মনে হয় কমিউনিষ্ট। ওরা বিদেশীকে সুনজরে দেখে না। আমি আরো এ ধরণের লোক দেখেছি, তারা চায় না যে কোন বিদেশী চীনে যায়। কারণ বিদেশীরা চীনকে শোষণ করে, উল্টে চীনেরই খোয়ার কাটে।

এতক্ষণে ল জিং হাউসে এসে গেছি, সুপ্রভাকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলাম।

সন্ধ্যার পর এলেন ডাক্তার। ইংরেজী বেশ বলেন, আবার শ্যাম ও হিন্দী অনর্গল বলে যান। ভারতের কথা তুলে তিনি ব্যাংককের এক স্বামীজীর বিষয় বল্‌লেন। সংসার-ত্যাগী হয়েও স্বামীজী দেশব্রতী, আবার বহু বিদেশী ভাষা জানেন। ভাবে গদ্‌গদ হয়ে ডাক্তার বল্‌লেন—

—এমন দিন দূরে নয়, যে দিন ভারত হবে স্বাধীন। ওই যে দেখছেন পাহাড়-পর্ব্বত ওখানে আমাদের লোক সব। সেখানে শ্যামবাসীর খাম-খেয়াল চলে না। আমাদের আদেশে ওঠে বসে। সিংকোরা থেকে ব্যাংকক যাবার পথে দেখা পাবেন সে সব দলের। তারা ভারতীয় পর্য্যটককে করবে সম্বর্দ্ধনা পর্য্যটকের কৃতিত্বে নয়, মাতৃভূমির প্রতি ভক্তি-অর্ঘ্য দানে।

ডাক্তারের কথা বিশ্বাস হলো না। পাডাং বুসার অবধি এত প্রশস্ত পথে দেখা পাই নাই একটি শ্যামবাসী লোকেরও, আর দুর্গম সে বনপথে পাব ভারত-বাসীর সাক্ষাৎ। চুপ করে শুনে গেলাম। ডাক্তার নিশ্চয় হিন্দুস্থানী, বাংলা বল্‌তো বাঙ্গালী হলে।

পরের দিন আবার বেরোলাম খনির ইউরোপীয় কোয়ার্টার্সে। সুপ্রভা নিয়ে গেল ম্যানেজারের কাছে। ম্যানেজার তাকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, চেয়ার দিল। সুপ্রভা বসলো, আমি দাঁড়ানো। ম্যানেজার অষ্ট্রেলিয়ান। পরিচয়ের পর আমি খনির লিজ ও গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য খাজনার কথা তুল্‌লে তিনি শ্যামদেশের খনি-ডিরেক্টরী একখানা দিয়ে বল্‌লেন—

এ বইটায় সব পাবেন। বই আপনি নিয়ে যেতে পারেন। কোম্পানীর তরফ থেকে আপনাকে পড়তে দিচ্ছি।

ধন্যবাদ জানিয়ে বই নিয়ে এলাম। অন্যান্য শ্বেতকায় অফিসাররাও ভারতীয়-শাড়ি-পরা সুপ্রভাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করলো। স্বাধীন দেশ বলে পরাধীন ভারতের নারীও শ্বেতের সম্মানার্হ, আর ভারতে সেদিনে ভারতবাসী শ্বেতকায়ের ঘৃণার পাত্র।

পরের দিন গেলাম বই ফেরত দিতে। একবার ডাক্তার আর সুপ্রভার সঙ্গে দেখা করে গেলাম।

—বইটা পড়েছি। লিজ এমন যে খনির প্রকৃত মালিকই শ্বেতকায়। রাজা যে কর বা লভ্যাংশ পান তা খনির আয়ের এক পার্‌সেণ্ট বল্‌তে গেলে।

ডাক্তার বল্‌লেন—লিজ নিলেও ভূপৃষ্ঠ-স্বত্ব (surface right) কিন্‌তে হয় প্রজাদের কাছ থেকে। শুধু কৃষি-জমি আর বাস্তর মালিক প্রজা, কিন্তু পড়ো জমির মালিক সর্ব্বত্রই রাজা। তবু সেয়ানা গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ পড়ো জমিরও দখলকারী প্রজা সাব্যস্ত করে দাঁড় করায় গ্রামের লোককে, তাই জমি কিন্‌তে হয় বিদেশী লিজওয়ালাদের ওই প্রজাদের কাছ থেকে। রাজ সরকারের লোকেরা বাধা দিতে পারে না। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের আদেশ কেউ ওল্‌টাতে পারে না।

সুপ্রভা সেদিন আর গেল না। আমিই গিয়ে অষ্ট্রেলিয়ান ম্যানেজারকে বই ফেরত দিয়ে এলাম। ধন্যবাদ জানাতেই সে বল্‌লে—পেয়েছেন সব সংবাদ ?

—হাঁ, পেয়েছি।

—পেয়েছেন তো, কিন্তু এতে আপনার লাভ কি ?

—লাভ আছে বই কি ! ভিক্ষে করে দেশ ভ্রমণ করি, এবার ভিক্ষে করে টিন খনির মালিক হয়ে শ্যামরাজকে দেব বছরে বছরে দয়ার দান।

সাহেব হেসে উঠ্‌লো সশব্দে, কিন্তু চোখ দুটিতে ফুটে উঠলো সর্পিল রোষ-বহ্নি। মনে মনে কৌতুকের হাসি চেপে রেখে বিদায় হয়ে এলাম। মলয়ের খনির শ্বেত-ম্যানেজারকে এমন বিদ্রূপ কর্‌লে কুকুর লেলিয়ে দিত। দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতকায় ম্যানেজারকে বল্‌লে রাইফেল নিয়ে তাড়া করতো। কিন্তু এ যে সর্ব্ব-স্বাধীন শ্যাম, শ্বেতকায়েরা এখানে কেঁচো।

অজানিতেই সাইকেল আবার আমায় নিয়ে এল ডাক্তারের বাড়ির রাস্তায়। একটা ঘরের দাওয়ায় দুটি শিশু কাঁদ্‌ছে চীৎকার করে। একটি আট-নয় বছরের বালিকা তাদের শান্ত করতে বৃথা-চেষ্টা কর্‌ছে।

কাছে গিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করেও মেয়েটির জবাব ঠিক বুঝলাম না। তবে কচি শিশুদের মা নাই একথাটা মালুম হলো। বাপ হয়তো কাজে গেছে। কষ্ট হলো মনে। একটা দোকান থেকে বিস্কুট লজেঞ্চ কিনে দিয়ে এলাম। শিশুরা ঠাণ্ডা হলো।

ডাক্তারের বাড়ি ঢুকে সুপ্রভাকে পেয়ে শিশুদের কথা বল্‌লাম। সুপ্রভা বল্‌লে—বুঝেছি, বুড়ো মাষ্টারের ছেলেমেয়ে। মাষ্টার-পত্নী সন্ন্যাসিনী হয়ে গেছে। তাই ছেলেমেয়ে মাষ্টারের ঘাড়ে পড়েছে। ছেলেপিলে নিয়ে তো আর সন্ন্যাসিনী হওয়া যায় না।

—বড় মেয়েটা কে ?

—পাড়া-পড়শি। নইলে মাষ্টারের মেয়ের বয়স চার বছর, ছেলের বয়স দু বছর। মাষ্টার বেচারার বড় কষ্ট। বুড়োকে কেউ বিয়ে করতে চায় না। তার মেজাজ বড় খিট্‌খিটে। শিশু দুটিকে একদিন আমি এনে এখানে রেখেছিলাম, বেশ ছিল। রোজ রোজ কি কেউ পারে! স্বামী সন্ন্যাসী হলে সন্তান নিয়ে পত্নীর কোন কষ্ট হয় না। তার পর বিয়েও হয় সহজে। এ যে পত্নীই সন্ন্যাসিনী, মাষ্টার নিরুপায়। মাষ্টারকে এড়াতেই পত্নী গেছে মঠে। তবে বেশি দিন সেখানে থাকবে বলে মনে হয় না। বেরিয়ে এসে অন্য কাউকে বিয়ে কর্‌বে নিশ্চয়।

সন্তানকে ফেলে মা চলে যায়, আমাদের ভারতীয় সংস্কারে এটা বাধে, তবু মুখ ফুটে কিছু বল্‌লাম না। সুপ্রভা যে ধাঁজের মেয়ে, তাতে নারীর সমাধিকার সমর্থন কর্‌বে, আর শ্যামদেশের নিয়মে এটা সমাধিকার ছাড়া কিছুই নয়। তবে আমার মতে সন্তানের পালনভার থাকা উচিত মায়ের ওপর।

পাহাড়ে-পল্লী দেখবো সুপ্রভাকে জানিয়েছিলাম। সমতলের শহর-গ্রাম দেখা হলো, খনি দেখা হলো, এবার পাহাড়। স্থির হলো কালই সকালে যাওয়া হবে।

লজিং হাউসের দিকে রওনা হলাম তখন সন্ধ্যা। মাঝে মাঝে সন্ন্যাসী চোখে পড়ে, কিন্তু অন্য ভিখারী দেখি নাই আজ অবধি শ্যামদেশে। বাজারের পাশে একটা ফাঁকা জায়গায় সিন্ টানিয়ে কাপড়-ঘেরা অভিনয়-মঞ্চ তৈরি করে চল্‌ছে পুতুল নাচ কেরোসিনের আলোকে। সে যেন রাম-রাবণের যুদ্ধ। বিকট চেহারার একটা পুতুল, সেটা রাক্ষস না হয়ে যায় না, তাকে তাড়া করেছে আর তিনটে পুতুল, মাথায় কলসীপানা মুকুট, হাতে রাম-দা, বাকি পোষাকে বৌদ্ধ ভিক্ষু ছাড়া আর কেউ নয়। তার মাঝে একটি আবার নারী, তার হাতে ছোরা। মাঝে মাঝে গান ও বক্তৃতা হচ্ছে অন্তরাল হতে শ্যামভাষায়। পর্দার কাছে একখানা রেকাব। দর্শকরা তাতে ফুটো তামার পয়সা ছুড়ে দিচ্ছে একটা দুটো।

বক্তৃতার পর বাহবা দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু গানের পর কেউ টুঁ শব্দটি করে না, একটা হাততালিও না। আমিও একটা পয়সা দিলাম। একটি তরুণকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাক্ষসটাকে তাড়ায় কেন?

—জানেন না, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা তুষমনকে তাড়াচ্ছে। ওটা নারী-চোর, মানবতার শত্রু। তাই ওকে ভয় দেখান হয়, দেশ থেকে তাড়ানো হয়। স্বাধীনতার স্বরূপ।

এ সময়ে রাক্ষস পুতুলটার কান্না কাকুতি সুরু হলো। আর ভালো লাগলো না, আমি লজিং হাউসে ফিরে এলাম। রাতটা কাটলো এক ঘুমে।

পরের দিন। পাহাড়ের ওপরকার পল্লী। সুপ্রভা সঙ্গে এসেছে। পাহাড় খুব বেশি উঁচু নয়। লুসাই পল্লী যাঁরা দেখেছেন তাঁরা এ পল্লীর ধারণা করে নিতে পারবেন সহজে। পাহাড় ও বনাঞ্চলে বাড়ি-ঘর ছোট ছোট, মাটির মেঝে, পাতার চাল। হঠাৎ দেখে মনে হবে মলয়-পল্লী, তবে মলয়রা পাহাড়ে বাস করে না। বরং বাংলার সঙ্গে তুলনা করা চলে, বিশেষ করে শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম জেলাকে।

কাছাকাছি ঘর তুলে পল্লী গড়া হয় হামেশা সকল দেশেই, কিন্তু শ্যামের পাহাড়-বাসীরা বাড়ি করে দূরে দূরে—অপরের আওতায় কেউ থাকবে না, সবাই যেন স্ব স্ব প্রধান। একখানা ঘরই এক-একটা বাড়ি। তা বলে একে-অন্যে ঝগড়া-ঝাঁটিও বড় একটা হয় না।

একটি ঘরে ঢুকলাম। সাধারণতঃ দাওয়ায় বসবার স্থান। বাপ্‌রে! ঘরের ভিতর যত রাজ্যের মারাত্মক অস্ত্র। বন্দুক, পিস্তল, কার্ত্তুজ-মালা, তলোয়ার, খাঁড়া, রাম-দা, হেঁসো। তবু লোকগুলার চেহারা কিন্তু তেমন নির্ম্মম নয়। পোষাক যদিও খাটো ছোট ধুতি, আর খালি গা, তবু যখন ওরা ঘরের বার হয় তখন পরে শ্যামদেশীয় লম্বা পা-জামা আর মাথায় দেয় কাউ-বয় টুপী (হ্যাট)। ঘরের ভেতর সে পোষাকও ঝুলান দেখলাম।

ঘর থেকে নেমে উঠানে পা দিয়েছি, অমনি গুড়ুম! গুড়ুম! বুকের ভিতর ছাঁৎ করে উঠলো। কি হলো আবার!

সুপ্রভা হেসে উঠলো, ঘরের মালিকও হাসলো।

—আপনি জানেন না, এরা মাঝে মাঝে এমনি ফাঁকা আওয়াজ করতে ভালবাসে। পৌরুষের চিহ্ন। অভ্যাসটা হয়ে পড়েছে বন্যজন্তু তাড়াতে তাড়াতে। এখন বন্যজন্তু এক শূকর ছাড়া অন্য কিছু এসে চড়াও হয় না।

—তবু ভাল, আমি ভাবলাম এদের লড়াই বুঝি, হাতিয়ারের যে ঘনঘটা।

—না, তা হয় না। ফাঁকা আওয়াজ এরা করে, বিশেষ করে মদের দোকানের মজলিশে। তখন এদের থাকে কাউ-বয় হ্যাট আর শ্যামদেশী পাজামা। এরা লেখাপড়া করেছে দস্তুরমত।

কয়েকটি পল্লীবাসী এল কাউ-বয় হ্যাট মাথায় পরে, সঙ্গে দুটি নারী আর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। নারীর পোষাক কোমর থেকে হাঁটুর নীচ অবধি রঙিন সায়া বা পেটিকোট। ফতুয়ার মত একটা জামা গায়ে, মাথায় খোঁপা নাই, চুল খাটো, হাতে গহনা শুধু আর্মলেট—সোনার। তারা এসে হিটলারী কায়দায় হাত উঁচিয়ে অভিবাদন জানালো, আমিও তাদের অনুকরণ কর্‌লাম। মুখে বল্‌লাম—নমস্কার।

অমনি চারদিক হতে 'নমস্কান্', 'নমস্কান্' রব উঠ্‌লো। উৎফুল্ল হয়ে তারা নানা প্রশ্ন কর্‌লো—ইংরেজী তারা বেশ বলে, সবাই শিক্ষিত। এদের গায়ের রং দেখলাম, সাধারণ অর্থাৎ সমতলবাসী শ্যামদের অপেক্ষা পরিষ্কার, ব্রহ্মদেশের লোকের মত, কিন্তু চেহারায় তাদের মতো বেঁটে নয়। নাক-চোখ টিকলো টানা-টানা।

তারপর সেখান থেকে নিলাম বিদায়। রাস্তায় এসে সুপ্রভা জানালো—

—এ ধরণের পল্লীপথে মাসাবধি চল্‌লে তবে পাবেন ব্যাঙ্কক। যদি পারেন তো সিঙ্কোরা গিয়ে দুটি সঙ্গী ভাড়া করে নেবেন। সে পথে সাইকেল চালানো বড়ই কষ্টকর। সাইকেল বয়ে নিতে হবে অনেক সময়। হেঁটে গেলেও মন্দ হবে না, না হয় দু' সপ্তাহ সময় বেশি লাগ্‌বে। একটু ঘুরা পথে যেতে হবে, কিন্তু দেশের সব দিক তো দেখা চাই।

—এখান থেকে আগে যাবো হাইজাই, তারপর সিঙ্কোরা। সেখানে পৌছে স্থির কর্‌বো হেঁটে যাই কি সাইকেলে।

রাস্তায় একটা দোকান-ঘরের দোরের দুপাশে নগ্ন-চিত্র আঁটা। কতকগুলা একেবারে কুৎসিত, মিলিত নারী-পুরুষ। সঙ্গে সুপ্রভা, বড় লজ্জা বোধ কর্‌লাম।

বিকালে ডাক্তার এল। আজ যেন তার মুখভার। বল্‌লে—

—শ্যামরা সিটিজেনশিপ বিদেশীকে দিতে কতকগুলা আইনের প্যাঁচ কষে রেখেছে। এই ধরুন আমার ছেলে, সে পাবে না নাগরিক অধিকার, আমার জন্ম শ্যামদেশে নয় বলে। অথচ দুনিয়ার সকল দেশেই পৌর অধিকার জন্মগত।

—নইলে যে থাইরা দু' দিনে সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। বিদেশীরাই দেশ জুড়ে ফেল্‌বে। এদের যে জন্মহার কম।

—এত কামোদ্দীপক নগ্ন-চিত্র দোকানে দোকানে, তবু প্রকৃত তথ্য জন্মহার কম ঠাওরালেন কেমন করে?

—সরকারী সংখ্যা দেখে, জন্মহার দেখে। তা হলে কুৎসিত চিত্র যদি জন্মহার বৃদ্ধির কৌশল হয়, তবে তা এদেশে নিরর্থক।

—ছবিগুলা সব শ্বেতাঙ্গ নরনারীর, তাই শ্যামবাসীকে বুঝাতে চেষ্টা করা হচ্ছে যে শ্বেতরাই ওরকম পশুবৎ আচরণ করে। থাইরা যেন তা না করে।

পরের দিন রওনা হবো তাদের বল্‌লাম। তারা যেন নিরানন্দ হয়ে গেল। বিদেশে স্বদেশের স্বজাতির লোকের প্রতি ভ্রাতৃভাবটা এমনি করেই প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরে।

রাতে লজিং হাউস ম্যানেজার অনুযোগ জানালো—

—শ্যামরা চীনা ভাষা পছন্দ করে না, কাউকে শিখতে দেয় না, এমন কি হাফ-কাষ্টদেরও না। এই দেখুন ডাক্তার-পত্নী, চীনা ভাষা মাঝে মাঝে বল্‌লেও চীনা আবহাওয়া তার আশপাশেও নেই। পোষাক পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছে।

রাতে ঘুম হলো না। তবু খুব ভোরে উঠে প্রাতরাশ সেরে রওনা হবো সাইকেল নিয়ে ডাক্তার এসে হাজির। পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বল্‌লে—

নমস্কার রামবাবু, শ্যামদেশের সত্যকার বনজঙ্গলে যাচ্ছেন, সিঙ্কোরার ঠিক উত্তর হতে দেখতে পাবেন নতুন জিনিষ। আর বেশি বল্‌বো না, গড্‌স্পীড্‌।

ডাক্তারের মুখের বাংলা বুলি নিমেষে আমায় অবাক্ করে স্বদেশের মায়ামোহে আনমনা করে দিল। মনে পড়্‌লো বাঙ্গালী কবির সুর—

'কোন্ ভাষা মরমে পশি'—
আকুল করি' তোলে প্রাণ?
কোথায় গেলে শুন্‌তে পা'ব
বাউল-সুরে মধুর গান?
চণ্ডীদাসের রামপ্রসাদের
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে!......'

উলু-বনে মুক্তা-মানিক

থাই-নারীর আক্রোশ

(ফরেষ্ট অফিস—হাইজাই—বাকাও বন—সিঙ্কোরা—মাতাগ্লাফ)

—থাই-রাজ্যে শফর কি জন্যে, মতলবখানা কি ?

—আরে মাতাগ্লাফ, মাতাগ্লাফ ! (গোয়েন্দা)

—ফিরে যাও ব্রিটিশের পোষ্য-পুত্র ! স্পাই মশাই !

—তুগ্‌গন, বেত-কাঁটা নিয়ে আয়, নয়তো কাচভাঙ্গা, সাইকেলটা ফুটো হয়ে যাক্‌।

—তার চেয়ে পচা কুয়োটার এক বাল্‌তি জল এনে ঢেলে দে মাথায় !

একদল তরুণ-তরুণী চারদিক থেকে ঘিরে ধরে মুক্তকণ্ঠে বাক্য-বাণ বর্ষণ কর্‌ছে। আর মাঝে মাঝে দিচ্ছে কি যেন একটা জিগীর। একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে গেলাম। হায়রান হয়ে গেছলাম লালাং (উলু) বনের ভিতর সাইকেল ঠেলে, তারপর এমন করে মৌচাকের মত ছেঁকে ধরা। গা-গতর্‌ ভেঙ্গে পড়লো।

—ওকি হচ্ছে তোমাদের ! খুন্‌-থাইয়ের সভ্যতা কি এই !

হঠাৎ একজন প্রৌঢ় এসে উচ্চরবে আমার পক্ষ সমর্থন কর্‌লো। সে আমায় দিল আশ্রয়। এক ধমকেই তরুণের দল মাথা হেঁট করে নীরবে চলে গেল যে যার ধন্দে।...

...   .

পাডাং বুসার শহর ছেড়ে এগোতেই দুপাশে উলুবন, আমরা বলে লালাং। তিন ফুট তো বটেই চার ফুটেরও বেশি উঁচু কোথাও সে নিবিড় উলু ঘাস। আবার কোন রকমে একটু নড়া-চড়া পেলেই তা থেকে লাখ লাখ মশা আর অন্য পোকা উড়ে আসে। করে ফেলে জীয়স্তে মরা। কাঁহাতক আর মুখে-চোখে হাত বুলানো যায়। জামার ভিতরও ঢুকে যায় উচ্চিংড়েগুলা। সে যে কী অভিজ্ঞতা ভুক্তভোগী ছাড়া বুঝ্‌বেন না।

কাজেই দশ মাইল উলুবন পেরিয়ে যখন পেলাম একটা ডাক্‌ বাংলো, আনন্দে নৃত্য কর্‌তে ইচ্ছা হলো। এক ভদ্রলোক এসে ফরেষ্ট অফিসার বলে পরিচয়

দিয়ে আমায় পথ থেকে ডেকে নিল। সমুখে ধরে দিলেন ভারতীয় খাদ্য অফিসার-পত্নী। কিন্তু অন্য পরিবেশে হলে এ লোকটা যথেষ্ট অফিসার বিশ্বাসই করতাম না। খাবার পেয়ে সব ভুলে গেলাম। জল আর গামছা চেয়ে নিয়ে খালি-গা হয়ে বেশ করে পুঁছে নিলাম, তখনো যেন সারা গায়ে আমার পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে এমনি কুট্‌কুট্‌ করছে।

খেতে বসলাম। লোকটি বল্‌লে—চট্‌পট্‌ খেয়ে নিন্ আপনার জন্য হাইজাই-তে লোক অপেক্ষা করছে। টেলিগ্রাফ করেছে কি না!

—ওঃ তাই ভারতীয় খাবার! কে করলে টেলিগ্রাম?

—কেন, পুলিশ। আর কে করবে? এ পথে মাঝে মাঝে হাতীর পাল নেমে আসে, সে বড় বিপদ।

—এ খবরদারির জন্য শ্যাম সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাডাং বুসারে ফেলে এসেছি আমার একমাত্র মশারি, কি করে আনাই, ভাই?

—শহরে গিয়ে থানায় খবরটা বলুন, তারা ব্যবস্থা করবে।

ধন্যবাদ দিয়ে—সাইকেলে উঠলাম। ঘণ্টা খানেক যাবার পর হুঁশ হলো, আরে উল্‌টো পথে এসেছি তো! ফিরেই চলেছি পাডাং বুসারে—ঐ যে ব্রিজটা আর মাইল ষ্টোন্। পোকার উৎপাতে মাথাটাও বিগ্‌ড়ে গেছে। আবার চল্‌লাম ডাক্ বাংলোর দিকে। সেখানে আর না ঢুকে প্রাণপণে সাইকেলে দিলাম গতিবেগ।

পাডাং বুসারে রেল লাইন দেখেছি—এখানেও রেল লাইন পার হয়ে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পেলাম হাইজাই শহর। একটা সাইন বোর্ডে লেখা Haadyai. কোন্ দেশী উচ্চারণ! একটু বোধ হয় হাঁ করে তাকিয়ে ছিলাম সেদিকে অমনি মৌচাকে ছেঁকে ধরলো—স্বাধীন শ্যামের ধুতি-পরা মৌমাছির দল—

—থাইরাজ্যে শফর কেন? মতলবখানা কি?...

... ...

যিনি আমায় আশ্রয় দিলেন, তিনি শ্যামবাসী। কিন্তু রাশভারি মেজাজে যেন রাজরাজেশ্বর। তাই থাই-তরুণ অপ্রতিভ হয়ে পালালো। তাঁর একটা লজিং হাউস ও হোটেল আছে। সেখানে আরামেই রইলাম। শ্যামদের লজিং হাউস বেশি নাই, ব্যবসাই ওরা খুব কম করে, করবার দরকারও হয় না, কারণ ওদের তো খোরাক-পোষাকের জন্য ভাব্‌তে হয় না—অধিকাংশেরই। ক্ষেতের ধান থেকেই সব মিলে।

আমার বিস্ময় হলো লজিং হাউস মালিকের প্রভাবে, তাঁর একটি মাত্র কথায় তরুণেরা নিরস্ত হয়ে শান্তভাবে চলে গেল। কিন্তু তারা মুখে ঝাল ঝাড়লেও হাত তোলে নাই। এটা শ্যামের দীর্ঘকালের মুক্ত আবহাওয়ার ভব্যতা। সে কথা বললাম আশ্রয়দাতাকে।

—আমাদের শ্যামের শিক্ষাদান এরূপ ধৃষ্টতা-বিরোধী। ওই-সব তরুণকে নিশ্চয় কোনো চীনা-শিক্ষক শ্যামভাষা শিক্ষা দিয়েছে। এ ধরণের অসহিষ্ণুর দল দিয়ে কি বিপ্লব সম্ভব, বলুন তো!

—আপনাদের দেশে আবার কিসের বিপ্লব?

—বিপ্লব অনেক কিছু নিয়েই হতে পারে, অন্ততঃ স্পর্শ লাগ্‌তে পারে প্রতিবেশীর। চীনে বিপ্লব, আপনাদের ভারতে অসহযোগ আন্দোলন। এই নিন সংবাদ-পত্র, দেখুন।

সংবাদ-পত্রে মন দিলাম। হোটেল মালিক এনে দিলেন এক কাপ ফেন-ভাত, যাকে 'স্তাং' বা 'খুভু' বলা হয়।

—এইটুকু আগে খান শরীর শীতল হবে, তারপর যা খুশি খেলেও আর অসুখ করবার ভয় থাকবে না।

ভাতকে একেবারে গলিয়ে ফেন শুদ্ধ করা হয় তরল, নুন মিশিয়ে দেওয়া হয়। বৌদ্ধ ধর্মে প্রভাবিত সকল দেশেই ফেনভাত শিশুর খাদ্য, রোগীর পথ্য, বৃদ্ধের ঔষধ, সুস্থের বলকারক আহার। তারা কেউ খায় না দুধ-দই। চীন, জাপান, শ্যাম, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া—সর্ব্বত্র এ ব্যবস্থা। এমন কি যে সব দেশে গোমাংস খাদ্য, বিশেষ করে আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, ইরানে পর্য্যন্ত চায়ের সঙ্গেও দুধ ব্যবহার করা হয় না। কেবল ভারত এ নিয়ম-বহির্ভূত।

ফরেষ্ট অফিসার বলেছিল আমার জন্য হাইজাইতে লোক অপেক্ষা করছে। ভেবেছিলাম গবর্ণমেণ্টের লোক। কিন্তু কোন লোক তো দেখলাম না প্রতীক্ষায়। তবে লজিং হাউস ম্যানেজার ধাঁজ-ধরণে যেমন দিকপাল, ইনি গোপনে সরকারী লোক হতে পারেন। লজিং হাউসের ম্যানেজারী যেন তাঁর দেহে-মনে আগন্তুক। তাছাড়া এমন দীর্ঘ-দেহ শ্যামদেশের আবহাওয়ায় জন্মে না। সরকারী লোক হওয়া অসম্ভব নয়। লোকটি মহা চতুর, তার কাছে কোন হদিস পাওয়া গেল না।

পরদিন বৌদ্ধ প্যাগোদাগুলা দেখলাম। কোন তরুণ-তরুণী অশিষ্টতা করে নাই। মঠ-মন্দির সবই এক ধাঁজে তৈরি। ইটের দেয়াল কিন্তু ওপরের ছাদ কাঠের

আর প্যাগোদার চূড়ার মত কতকটা। একটা মন্দিরে আবার রাম-লক্ষ্মণ-সীতা মূর্ত্তি। রাম-মূর্ত্তিটি পাণ্ডুবর্ণ, কিন্তু লক্ষ্মণ আর সীতা হল্‌দেপানা। পূজারী ব্রাহ্মণ দেখলাম না। শ্রমণেরা মূর্ত্তি তিনটি সাজাচ্ছে, ওরাই দেখা-শুনা করে মনে হলো।

ভিক্ষুরা সকলেই পালি ভাষায় পণ্ডিত, অনেকে ইংরেজী, ফরাসী ভাষা চমৎকার বল্‌তে পারে। পালিভাষার বইও তাদের রোমান্‌ (ইংরেজী) হরফে ছাপা। ভিক্ষুরা আমায় নিয়ে বসিয়ে জেরা কর্‌তে লাগলো কেন শ্যামদেশে ভ্রমণে এলাম।

—দেশ-বিদেশের রীতি-নীতি দেখে শিক্ষালাভ করবার জন্য।

কথাটা তারা বিশ্বাস করলো না।

—বড় সেয়ানা বুলি, রীতি-নীতি দেখা। রীতি-নীতি মানে তো দেশের গোপন খবরটিও। তা হলে উদ্দেশ্য সে খবর ধূর্ত্ত ইংরেজের কাছে বিক্রি করা। নইলে দেশের হালচাল তো দিন দিনই বদলায়। হালে পাকা বাড়ি হয়েছে, আগে ছিল না এ শহরে। ইউরোপীয় হোটেল হয়েছে, শ্বেতদের পোষাক খানা-পিনা নকল করছে থাইরা হ্যাট-নেকটাই আর কাঁটা-চামোচ ব্যবহার করে। অস্পৃশ্য দুধ পান, বল্ নৃত্য—সব রেওয়াজ হচ্ছে। এ দেখে লাভ কি ? দু'দিন পরেই তো আবার নতুন ফ্যাশান চালু হবে। সে তো কথা নয়, আসলে তুমি স্পাই। হুঁশিয়ার ইণ্ডিয়ান, এ তল্লাটের ক্ষেপাদের ধারে-কাছেও যেও না। একেবারে ক্ষেপাদের কেল্লায় ঢুকে পড়েছ। সাবধান !

এদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে লাভ নাই। এদের ধারণা দূর করবার কোন যুক্তিই পেলাম না। সংস্কার বড় বেয়াড়া জিনিষ, পাঁচ মিনিটে গৈরিক ত্যাগ করে শ্যামদেশের সন্ন্যাসীরও তলোয়ার-বন্দুক নিয়ে চড়াও হওয়া বিচিত্র নয়। গৈরিক যতক্ষণ অঙ্গের ভূষণ, ততক্ষণ অস্ত্র দূরে থাক আঙ্গুল দ্বারা আঘাত করবারও অধিকারী নয় সন্ন্যাসীরা।

চলে এলাম রাস্তায়, কিন্তু আমায় ভাবিয়ে তুলেছে। ছেলে বুড়ো সবারই এ অঞ্চলে এ রকম বিষম সন্দেহ-বাই কেন ? এ ছিটের নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে গুরুত্বপূর্ণ। অনেক জাতের শ্বেতকায়ই তো এখানে, তবে বিশেষ করে ইংরেজ-বিদ্বেষ কেন ? কাউকে সে কথা জিজ্ঞাসা করলে, ওদের সন্দেহ আরো বাড়বে।

রেল ষ্টেশন দেখলাম মস্ত বড়। ব্রিটিশ অফিসার ঢের। আমেরিকানও আছে। ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে লজিং হাউসে ফিরছি দেখা হলো দু'জন ভারতীয়ের সঙ্গে। একজন হিন্দু, অপরটি মুসলমান। দু'জনই চট্টগ্রামবাসী।

—নমস্কার, আমি রাজেন ভট্চায্, আপনাদের সেবক। আর ইনি মিষ্টার মু—। এর বেশি পরিচয় চাইলে অভদ্রতা হবে মিঃ বিশ্বাস। দেশের খবর রাখেন ?

—যদি সংবাদ-পত্রকে বিশ্বাস করা যায়, তবে রাখি কিছু, নইলে কিছুই না।

লজিং হাউসে বসে কথা চললো। বুঝলাম রাজেন্ ভট্চায সোজা লোক নন্। মিঃ মু— তো বেজায় গম্ভীর। দুজনারই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি একটি সত্যই প্রকাশ করে, তা হলো, চট্টগ্রাম এদের মত ফায়ার-ব্র্যাণ্ডকে (আগুন-মার্কাকে) কোলে রাখতে পারে নাই, এঁদের অস্থি-মজ্জা হতে ফস্ফরস তীব্র জ্বালায় বিচ্ছুরিত হয়ে দাবদাহ সৃজন করায়।

ভট্চায তো দুনিয়ার সকল দেশের পত্র-পত্রিকা হজম করে আন্তর্জ্জাতিক বিশেষজ্ঞ। তাঁদের আড্ডায় দেখেছি সকল দেশের সংবাদপত্র। মিঃ মু— একের নম্বর শ্বেত-বিরোধী থাইদের মত। এঁরা যখন আমার ভ্রমণকে করতেন উপহাস, তখনই আমার মুখ শুকিয়ে যেতো। ফায়ার-ব্র্যাণ্ডদের অসাধ্য কিছু নাই।

—আচ্ছা, এদেশের লোকের এত ইংরেজ-বিদ্বেষ কেন ? বিদেশীকে সন্দেহ যেন ওদের মজ্জাগত।

—হবে না, রাজা প্রজাধিপক বিদেশীদের বিশেষ করে ইংরেজদের জমি দিয়ে, খনি দিয়ে, কারবারের বিশেষ সুবিধা দিয়ে, রেলওয়ে চালাতে দিয়ে যেন গোটা শ্যামদেশটাই তাদের হাতে সঁপে দিতে চায়। তাই শ্যামের স্বাধীন জনগণ জাগিয়ে তুলছে বিপ্লব রাজাকে বিতাড়িত করতে।

—ওঃ, তাই পাডাং বুসারের ডাক্তার বলেছিল এখানে নতুন জিনিষ দেখতে পাবো।

—শুনুন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৪ খৃঃ অঃ ভারতীয় সেপাইরা বিদ্রোহী হলো সিঙ্গাপুরে। শ্যাম, জাপান ইংরেজের পক্ষে। সেপাইরা সিঙ্গাপুর থেকে বিতাড়িত হলো, পালিয়ে এসে এক দল আশ্রয় নিল শ্যামে। বন্ধু ইংরেজের ইঙ্গিতে রাজা প্রজাধিপক সেপাইদের করলেন নির্ম্মূল। এমন নৃশংস পাশবিকতা আর কত সহ্য করা যায়। প্রজাধিপককে যেতে হবে।

রাজেন ভট্‌চায উত্তেজিত হয়ে চুপ করলেন। মিঃ মু— বলে চললেন—

—ভারতবাসীর দেশ নিজের নয়, তারা নিরস্ত্র, নিরুপায়, তারা তো অহিংস-আন্দোলনই করবে। কিন্তু সে অহিংসা বোঝে না মুসলমান, বোঝে না হরিজন, তাই ভারতের বিপ্লবে স্পর্শ নাই জনগণের। কিন্তু থাইদের জমি আছে, অস্ত্র আছে, আছে অহিংস ঐতিহ্য, তাই তারা অহিংসা বর্জ্জন করে হিংসার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বিপ্লব তাদের করবার কথা নয়। ঘরে মরাই-ভরা তিন বছরের ধান, বিক্রি করলেই শ'য়ে শ'য়ে টিকেল। জনগণ বিপ্লব করে যখন পেটে হাত পড়ে। কিন্তু খুন-থাই স্বাধীনতার স্বাদ জানে, স্বাধীনতার অবাধ গতিতে বাধা এসেছে, তাই থাইরা আজ রিভলিউশনারী। এখানে বিপ্লবের নেতা জনমত।

অহিংসার ওপরে হিংসার স্থান—এসব কথার মারপ্যাঁচে মাথা গুলিয়ে গেল। গান্ধী-দর্শন পশুবলকে হেয় মনে করে। অথচ এরা হিংসায় বিশ্বাসী। চুপ করে গেলাম। আর কোন রাজনীতিকের খপ্পরে পড়বো না। আমায় চুপ করে যেতে দেখে তাঁরা বললেন—

—এখনো চোখ খোলে নি আপনার। কাল থেকে আমরা আপনাকে দেখিয়ে আনবো যা আপনার দেখা দরকার।

তাঁরা চলে গেলেন। কিন্তু আমার ইচ্ছা হলো সাইকেল বিক্রি করে চলে যাই ফিরে মলয় রাজ্যে। রাজনীতি-গবেষণার যোগ্য মস্তিষ্ক আমার নয়, তাছাড়া কপটতা সহসা বাসা বাঁধে না অন্তরে।

রাজেন্‌ ভটচায-এর সঙ্গে থিয়েটারে গেছি। দুটি অভিনয় হবে, একটি পৌরাণিক—রাম বনবাস। দ্বিতীয়টি সামাজিক। অভিনয় সুরু হলো, বনবাস তৃতীয়-রামের। প্রথম ও দ্বিতীয় রাম কে কে, সে কথা কেউ বলে নাই। দশরথ শয্যাশায়ী, কৌশল্যা অশ্রুসিক্ত, কৈকেয়ী হেঁটমুখ। রাম লক্ষ্মণ সীতা বনবাসের যাত্রায় উদ্যত। এমন সময় এল সংগ্রাম-রত দুই সহচরী—একটি মন্থরা, অপরটি হয়তো বড় রাণীর তরফের। দুজনে হলো প্রথম বাক্‌-যুদ্ধ, তারপর চুলাচুলি, তারপর কামড়াকামড়ি। যেমন তেমন কামড় নয়, কামড়ের অভিনয় নয়, একেবারে রক্তারক্তি কামড়—সত্যিকারের। ভাল লাগলো না—এক ঘণ্টা অভিনয়ে রাম বনবাস শেষ হলো।

তারপর সামাজিক নাটক। গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ সভা। বিচার-প্রার্থিনী নারী। অভিযোগ—স্বামীকে কাজ করতে বলায় সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেছে। এমন

কর্ম্ম-বিমুখ স্বামীর মঠবাসী হবার অধিকার নাই, এতে আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে কামনানের বিচার অচল, সে অধিকার মঠাধ্যক্ষ ভিক্ষুর। অভিযোগ খারিজ হলো।

অভিযোগকারিণী দমে গেল না। সে একটি পুরুষকে স্বামী সাজিয়ে নিয়ে মঠে গেল। ভিক্ষুদের ফল-মূল সিগারেট দিয়ে খুশি করলো। তারপর তার বিবাগী স্বামীর কাছে গেল। সে তো স্ত্রীকে অপরের সঙ্গিনী দেখে জ্বলে উঠ্‌লো। তৎক্ষণাৎ গৈরিক ছেড়ে মঠ থেকে বাড়ি ফিরে এল সে। তখন তার স্ত্রী পাড়ার সকল নারীকে ডেকে সবাই মিলে স্বামীকে দিল বেদম প্রহার। হাত-পা বেঁধে ঘরের কোণে ফেলে রাখ্‌লো, খেতেও দিল না।

অতিকষ্টে বন্ধন-মুক্ত হয়ে স্বামী পঞ্চায়েতে নালিশ জানালো। ডাক্তার সাক্ষী দিল। পঞ্চায়েতের হাবভাব দেখে স্ত্রী বুঝ্‌লো ওরা স্বামীর পক্ষ নেবে, তাই আপত্তি জানালো—'এ রকম পঞ্চায়েৎ সুবিচার করতে পারে না, কারণ, আগেই ওরা মন্তব্য করেছে আমার কথা না শুনে। এ পঞ্চায়েৎ বে-আইনী, আমি মানি না ওদের, নতুন নির্ব্বাচন হোক।' আরো কয়েকটি নারী সে কথা সমর্থন করলো।

গ্রাম্য কেরানির নির্দ্দেশে নতুন নির্ব্বাচন চল্‌লো। যে সকল গ্রামবাসী স্ত্রী-কর্ত্তৃক প্রহৃত হয়েছে তারাই ক'জন পূর্ব্ব পঞ্চায়েৎকে ভোট দিল, গ্রামের বাকি সব নরনারী ভোট দিল নতুন লোককে। নতুন পঞ্চায়েৎ বিচারে বস্‌লো। অবাধ্যতার জন্য স্বামীর অর্থদণ্ড হলো পাঁচ টিকেল। স্ত্রী সে টাকা জমা দিয়ে স্বামীকে মুক্ত করে কানে ধরে নিয়ে চল্‌লো ঘরে, যেন সে পাঁচ টিকেলে কেনা গোলাম।

স্বামী কেঁদে কেঁদে গান ধর্‌লে—

'ভাতার হওয়া কি ঝকমারি!'

গানের সুর হুবহু নেপালী ধরণের। সে ভারতীয় রেশ মর্ম্মস্পর্শী করে তুলেছে সমগ্র অভিনয়কে। মনের কোণে উঁকি ঝুঁকি দেয় সেকালের সেই চতুর্দ্দশ শতকের ইবন বাতুতার ভ্রমণ-কাহিনী। প্রশান্ত মহাসাগরের তাওয়ালিসি রাজ্যে তিনি দেখেছিলেন নারীর হাতে রাজ্য-শাসন, নারী সেনাদলের দেশরক্ষা, যুদ্ধ পরিচালনা। সে রাজ্য শ্যামদেশ থেকে বেশি দূরে থাকবার কথা নয়! আজ পাঁচ শ' সাড়ে পাঁচ শ' বছর পরে কি শ্যাম আবার সে আদর্শের দিকেই এগিয়ে চলেছে?

অভিনয় শেষ হলো।

শ্যাম দেশের থিয়েটারে সকল ভূমিকাই গ্রহণ করে নারী, কোন পুরুষ অভিনেতাকে গ্রহণ করা হয় না। পুরুষেরা বাজায় কনসার্ট, ষ্টেজ বেঁধে দেয়, অভিনয় করে নারী। অথচ পুতুল-নাচ দেখায় পুরুষেরা, সেখানে নারীর স্থান নাই।

অভিনয় দেখে মনে হলো থাই-নারীর আক্রোশ নাটকে রূপায়িত। সেদিকে তারা মলয়-নারী অপেক্ষাও দুর্দ্দান্ত এবং জোর-জুলুমেই স্বামীকে বশ রাখতে ইচ্ছুক।

পরের দিন আমায় নিয়ে গেল এক ইংরেজ খনি-ম্যানেজারের বিদায়ী ভোজ-সভায় (farewell)। তিনি বসে আছেন সজ্জিত আসনে, সিংহাসনে আর কি! নিমন্ত্রিতেরা যাচ্ছে আর করমর্দ্দন করছে তাঁর সঙ্গে। সরকারী কর্ম্মচারী, অন্য খনির শ্বেতকায় অফিসার, রেল-কর্ত্তৃপক্ষ। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভোজ সুরু হলো—মদ, মাংস, ইউরোপীয় খানা। বেসরকারী দেশীয় লোক নজরে পড়লো না। অন্য এক সামিয়ানার তলায় খনি মজুর ভূঁইয়ে বসে সামসু পান করছে।

এর আর দেখ্‌বো কি! কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে নাই। আমিও কিছুক্ষণ দেখে ভোজে যোগদান না করেই চলে এলাম। ভোজ-শেষে বক্তৃতার জন্য অপেক্ষা করি নাই।

বাইরে যেতেই রাজেন্ ভট্‌চায্ বল্‌লেন—মজা দেখুন, কোম্পানী দিল বিদায়ী ম্যানেজারকে পাঁচ হাজার ডলার বিদায়-উপহার। আর যে খানাপিনা আসরের সাজগোজ, তার বেলা টাকা আদায় করা হলো কুলি-মজুর-কেরানি, যত সব গরীবের দলের কাছ থেকে।

—সে গরীবেরা খেতেও পেল না?

—পেল সামসু মদ আর কিছু না।

—আমাদের কবির বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য,…

'এ জগতে হায়, সে-ই বেশী চায়
আছে যার ভূরি ভূরি;
রাজার হস্ত করে সমস্ত
কাঙ্গালের ধন চুরি।…'

—সাম্রাজ্যবাদীর স্বভাবই এই। ইতিহাস সাক্ষী। এখন বিদায়, রামবাবু, কাল আস্‌বো। যা দেখলেন রাতে শুয়ে শুয়ে একটু ভেবে দেখবেন এ শোষণের, এ উপেক্ষার, এ তাড়নার জ্বালা থেকে মুক্তি কোন্ পথে।

মিঃ মু—বল্লেন—শ্যামের মত স্বাধীন রাজ্যেও শ্বেতের শোষণ, শ্বেত-অশ্বেত ভেদাভেদ, তা কেবল অশ্বেতকে নিকৃষ্ট জীব ভাবে বলেই তো!

আমি বল্লাম—একথা আমি স্বীকার করি না। ইউরোপে তবে চলে কেন শোষণ, বিশেষ করে বল্কান রাজ্যগুলাতে। সেখানে তো শ্যামের মতোই দশা।

—তা হলেও বলকান্‌বাসীরা শ্বেত-সমাজে অপাংক্তেয় নয়। সেখানে কতকটা সাম্য। কাল আসবো রামবাবু।

পরদিন আবার রাজেন ভট্‌চায আর মিঃ মু—। কেবল বক্তৃতা, আমি এড়াতে চাই। কিন্তু এঁরা আমায় স্বস্তি দেন না। প্রকাশ্যে কিছু বলি না। কিন্তু আর পারলাম না তাঁদের মন জোগাতে।

—দেখুন রামবাবু, স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। থাইরা তা বেশ বোঝে। থাই-নারী ভারতের যে কোন প্রদেশের নারী অপেক্ষা অনেক অগ্রসর, যদিও উচ্চ-শিক্ষিত নয়। থাই-নারী স্বামীর উপার্জ্জনে নির্ভর করে না, স্বামীর স্বেচ্ছাচার সহ্য করে না। এদেশের প্রবাসী-চীনা কি হাফ-কাষ্ট নারীরাও না। এমন স্বাধীনতা কি ভারতে কাম্য নয়?

—ভারতের কাম্য কি তা বুঝবো ভারতের মাটিতে পা দিয়ে। আমার জীবনের কতটুকু যোগ ভারতের সঙ্গে। জীবন তো কেটেছে বিদেশে। পৃথিবী ভ্রমণ শেষ করে যখন দেশে ফিরবো, তখন আপনার কথা তোল করে দেখবো। তার আগে নয়। এখন শ্যামদেশের সঙ্গে করবো পরিচয়। বিদায় ভাই।

হতাশ হয়ে তাঁরা ফিরে গেলেন। আমি একটু সন্ত্রস্ত হয়েই রইলাম। হাইজাইতে আর মন বসে না। দেখতে হবে সিঙ্কোরা। কিন্তু আমার উত্তর-শ্যামের পর্ব্বতময় পথে যাত্রা করতে হবে নাকি আবার সিঙ্কোরা হতে হাইজাই ফিরে এসে। আর মিছে দেরি করলাম না। রওনা হলাম সিঙ্কোরা উদ্দেশে। হাইজাই হতে সোজা পূব দিকে সাগরতীরে সিঙ্কোরা শহর।

নতুন তৈরি পথ। অতি চিত্তাকর্ষক। দু'দিকে বাকাও বন। হাজার হাজার বাকাও গাছ। পাতা কাঁঠাল-পাতার মত পুরু, গাছ লম্বায় কুড়ি হাতের বেশি হবে না, তবে খুবই ঝাঁকড়া। গাছগুলা সবই জটাল, প্রতি গাছ থেকে অসংখ্য জট অর্থাৎ ঝুরি নেমেছে মাটিতে। আর মাটির ওপর দিয়েই তার মোটা মোটা শিকড় এঁকেবেঁকে গিয়েছে সারা বন ছেয়ে—সে শিকড়গুলা থেকে কোঁড় বেরিয়ে প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। সে এক বিচিত্র দৃশ্য। বাকাও সে দেশে

জ্বালানী কাঠের প্রধান উপাদান। তার সঙ্গে তুলনায় পাহাড়-গায়ের গর্জন গাছ যেন বিরাট দৈত্য—ছ'শ তিন শ' ফুট লম্বা অতিস্থূল দেহ নিয়ে পাহাড়টারই দোসর, পাহাড়ের ওপরে সবুজতার দ্বিতীয় পাহাড়।

এখান থেকে পূব দিকে সাগরতীর পর্য্যন্ত কেবল বাকাও বন, অন্য গাছ নাই। দূর থেকে কিন্তু মনে হয় সযত্ন-রক্ষিত কাঁঠাল বাগান বুঝি। তবে কাঁঠাল গাছে ঝুরি নাবে না। সে জঙ্গলের ভিতরও দূরে দূরে ছুটি একটি গ্রাম রয়েছে।

একটি পল্লীতে ঢুকলাম খাদ্যের সন্ধানে। কিন্তু বিফল প্রয়াস। পয়সা দিয়ে কিন্‌তে চেয়েও কোন খাদ্য মিলে নাই। এরা বন থেকে ফল-মূল আহরণ করে, ফাঁদ পেতে ধরে পাখী। খাদ্য এদের সঞ্চিত থাকে না। সময়ে গাছের পাতার ঝোল কি সাপের মাংস রান্না করে খায়, অন্য কিছু মিলে না।

মাইল তিনেক এসে আর একটা গাঁ। মহা সোরগোল। জিজ্ঞাসা করেও জবাব পাই না। ছ'এক কথায় যা জবাব দেয় তার মানে বুঝি না। এমন সময় একটি লোকের দেখা পেলাম। কথায় বুঝলাম তিনি পণ্ডিত লোক, পাঠশালার শিক্ষক হয়তো। তাঁর মুখের শ্যামভাষায় পরিষ্কার সংস্কৃত শব্দ। আমিও বাংলায় বাছা বাছা বিশুদ্ধ কথা ব্যবহার করলাম। আর বেগ পেতে হলো না।

সোরগোলের কারণ তিনি বললেন—

কোনো কৃষক তার পুত্রের জন্য একটি তরুণীকে পছন্দ করে রাত্রিযোগে নিয়ে আসে আপন ঘরে। তরুণী কিন্তু কৃষক-পুত্রকে বিবাহ করতে গররাজি হয়, কারণ ছেলেটার একচোখ কাণা। তরুণীর বাপ-মা যখন জান্‌তে পারলো তাদের মেয়েকে কৃষক আটক করেছে, তখন তারা গ্রাম্য পঞ্চায়েতে নালিশ করলো। কামনান, পূজাইবানেরা কৃষককে বন্দী করেছে। গ্রামবাসী উত্তেজিত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে কৃষকটার বিরুদ্ধে। তাই এ হৈ-হল্লা।

আমার কাছে এটা তেমন গুরুতর অপরাধ বলে মনে হল না। তবু জান্‌তে চাইলাম কামনানের বিচারে কি সাজা হবে বলে তাঁরা মনে করেন।

—প্রাণদণ্ড! প্রাণদণ্ড!

—বলেন কি!

কথাটা বিশ্বাস হলো না। হয়তো লোকটার ওপর আক্রোশ আছে তাই বাড়িয়ে বলছে। আমার মনের ভাব হয়তো মুখেচোখে প্রকাশ পেয়েছে।

—আপনি বিদেশী, তাই সন্দেহ করছেন। কারও স্বাধীনতা হরণ চরম অপরাধ এদেশে।

শুনে আর অপেক্ষা করি নাই। ফিরে এসে সিঙ্গোরার পথ ধরলাম।

শুক্‌নো মুখে, পেটের জ্বালায় সাইকেল চালালাম মরিয়া হয়ে। প্রত্যেক শ্যামবাসীই কি খুনে? কথায় কথায় ছিন্নমুণ্ড, কথাটা ভাবতেও মাথা ঘুরে যায়। অথচ সিঙ্গোরা শহর এখান থেকে বেশি দূরে নয়।

ওই সিঙ্গোরা। এবার ধড়ে প্রাণ এল। শহরে নিশ্চয় এ-রকম খাম খেয়ালের বাড়াবাড়ি নাই। একটু মনভোলা হয়েই শহরে প্রবেশ কর্‌তে যাচ্ছি।

—স্যাই, স্যাই, শুনুন্। আপনার জন্যেই অপেক্ষা কর্‌ছি।

ফেজটুপী মাথায় দু'মূর্ত্তি—মলয়ের স্মৃতি বয়ে নিয়ে এল। নইলে স্বাধীন শ্যামে ও-পাট নাই। কথায় বার্ত্তায় তো এরা মুস্‌লিম নয়। হিন্দুস্থানী উচ্চারণ বটে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী কথায়, কিন্তু 'খুদা' মুখে নাই। ভাব্‌লাম হয়তো শ্যাম-সরকারের হুঁশিয়ারী ব্যবস্থা আগেকার মত।

—কেন বল তো?

—আমরা পায়ে হেঁটে এ দেশ দেখছি। পেনাং থেকে হেঁটেই এসেছি, ভারত থেকেও। চলুন আপনাকে ভাল লজিং হাউসে নিয়ে যাই। তারপর একসঙ্গেই দেখা যাবে সব।

—তা তো যাবে। তোমাদের মাথায় ফেজটুপী কেন?

—আমরাও হিন্দু, ফেজ পরেছি মলয়দের কাছে খাতির পাবার জন্য। তা তারা খুব আদর-আপ্যায়ন করেছে।

লজিং হাউসে রুম পেলাম। ফেজটুপীরা স্নান আহারের জন্য বিদায় নিল, বিকালে আস্‌বে বল্‌লে। আমিও বাথ-রুমে গেলাম। ফিরে এসে দেখি আমার সেই তারে বুনট ধুচুনির ভিতরকার পোঁটলা-পুঁটলি কে তছনছ করে রেখেছে। চোর এল নাকি?—না, কিছু তো খোয়া যায় নাই।

লজিং হাউস ম্যানেজারকে ডেকে দেখালাম। সে বললে—

—ফেজটুপী মাথায় দুটো লোক তো ঢুকেছিল, আপনার সঙ্গে যারা ছিল। তারা একবার চলে গেল, আবার ফিরে এসে ঘরে ঢুক্‌লো। এ নিশ্চয় তাদের কাজ। রকম সকমে এরা স্পাই বলে মনে হয়।

—কি ভয়ানক! স্বাধীন শ্যাম সরকার ইংরেজের এ গোয়েন্দাগিরি অবাধে সহ্য করে?

—না, তা কর্‌বে কেন! শ্যামবাসী এদের ওপর খড়্গহস্ত। ক'দিন এখানে থাকুন, সব মালুম হবে এখন। আবার ওরা এসে বিরক্ত কর্‌লে আমায় জানাবেন।

—ওরা বিকালে আসবে বলেছিল।

—বেশ তা হলে। বিকালে আপনি আমার ঘরে থাকবেন। দেখে' নেব কত বড় সেয়ানা এ বেয়াড়া ভারতীয় গোয়েন্দা।

বিশ্রাম করে বেরোলাম শহরে। দেখতে পেলাম সিন্ধী ব্যবসায়ীর দোকান। আমায় খুবই সমাদর কর্‌লেন, সকল রকম সহায়তা তিনি কর্‌বেন। তবে হুঁশিয়ার করে দিলেন কোন রাজনীতিকের দলে যেন না মিশি—না ভারতীয়, না শ্যামবাসীর।

সিঙ্গোরা সাগর-তীরের শহর। জেটি আছে। মাঝে মাঝে জাহাজ আসে যায়। মাল জাহাজই বেশি। শুন্‌লাম অনেক সিন্ধী এখানে কারবার করে। রাস্তায় আস্‌তে আস্‌তে আরো সিন্ধী দালাল আর ব্যবসাদারদের দেখা পেলাম। তারা সবাই ব্যস্ত। সন্ধ্যায় তাদের 'মজলিশ'-এ যেতে বল্‌লো।

বিকালে তাউঁকী অর্থাৎ লজিং হাউস ম্যানেজারের ঘরে বিশ্রাম কর্‌তে গেলাম।

—দেখুন মিঃ পর্য্যটক, ভারতীয় গোয়েন্দা প্রায়ই আজকাল দেখা যায় এখানে। তারা যে সকল ভারতীয় অপরাধীর সন্ধানে ফেরে তারা এখানে আসে না, যায় পাহাড়ে, যায় ব্যাঙ্ককে। সে সব ডানপিটে ক্ষেপা রাজনীতিক ভারত থেকে এসে এমন মিলে যায় শ্যামবাসীর সঙ্গে যে গোয়েন্দারা তাদের কোন খোঁজই পায় না। শ্যামবাসী কোন খবর দেয় না গোয়েন্দাকে।

—বাঃ বেশ তো আপনার দেশের স্বাধীন লোকগুলা। তবে স্পাইরা এখানে ঘুরে বেড়ায় কেন?

—এদের একটা কিছু কাজ দেখাতে হবে তো মনিবকে, তাই যত নির্দ্দোষ ভারতীয়কে করে টানাটানি। কোনো ভারতীয় সমুদ্র-পথে পালায় কি-না, ভারতীয় মজুর যারা আসে তাদের ভিতর ছদ্মবেশধারী কেউ আছে কি-না,

এ সবই সন্ধান করে বেড়ায়। এদের অসাধ্য কিছু নেই, বাগে পেলে টাকা-পয়সা, পাস্‌পোর্ট—যা পায় তা-ই চুরি করে বা ছিনিয়ে নেয় আইনের ভয় দেখিয়ে।

একটা লোক এসে তাউকীর কানে কানে কি বললে, তাউকী উঠে গেলেন। বল্‌লেন—আপনি এ ঘর থেকে বেরোবেন না। চেল্লাচিল্লি শুনেও না।

আমি ঘুমোতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু অবেলায় কি কেউ ঘুমোতে পারে? ছুপ্‌দাপ্‌ দ্রুত পদশব্দ, যেন ছুটোপাটি, তারপর সব নীরব। লজিং হাউসের কেরানি এসে বল্‌লে—এখন আপনার ঘরে যেতে পারেন।

ঘরে এসে দেখি সবই ঠিক আছে। কোন ধ্বস্তাধ্বস্তির লক্ষণ তো নাই। আরে মেঝেয় পড়ে আছে ওটা কি? চক্‌চক্ কর্‌ছে?

এ যে টোকন্! পুলিশের টোকন্ পিতলে তৈরি, মাঝখানে ক্রাউন্ 'এইচ্‌ এম্ এস্ ৩৫৩ নং' লেখা—তলায় খুদে খুদে হরফে খোদাই—Fear God অর্থাৎ পরমেশ্বরকেই ভয় করবে আর কাউকে নয়।

টোকনটা উপহার দিলাম তাউকী মশায়কে। তিনি হেসে উঠ্‌লেন। স্পাইদের কথা আর জিজ্ঞাসা করি নাই। কি দরকার ঘাঁটাঘাঁটি করে! ব্যাপার তো বুঝেছি। শ্যামবাসী বাইরে থেকে দেখতে যত হাবাগোবা, আসলে তারা তেমন ভ্যাবাকান্ত নয়। চৌচাপটে কাজ কর্‌তে চোস্ত।

বেরিয়ে পড়্‌লাম, যেতে হবে সিন্ধীদের মজলিশে। বারো তেরটি সিন্ধী বসে আছেন ফরাসে, টেবিল চেয়ারেরও ব্যবস্থা আছে, তবে সেখানে কেউ বসে নাই। মজলিশ হলো তাদের ব্যবসায়ের এসোসিয়েশন। নানা রকম কথা হলো। জলযোগের ব্যবস্থাটা ছিল চমৎকার। রাতে আর খেতে হয় নাই।

—আচ্ছা ভারতীয় মজুর এখানে কোথা কাজ করে?

—করে ইষ্ট এশিয়াটিক কোম্পানীর কারখানাগুলায়। তাদের রকম রকম ব্যবসা।

—বাঙ্গালী এখানে আছে কি?

—না বাঙ্গালী নেই। থাক্‌বে কেন? যারা চাক্‌রি নিয়ে আসে তারা ব্যাঙ্কক্‌কেই পছন্দ করে, এমন বাকাও বনে ঢাকা সমুদ্রতীর তাদের ধাতে সয় না। আর যারা আসে দেশত্যাগ করে, তারা এখানে দু'একদিন লুকিয়ে থেকেই জাহাজে চড়ে চলে যায় হংকং, সাংহাই, কোবে। বেশি যারা আটপিটে তারা উত্তরের পাহাড়ে-পর্ব্বতে গিয়ে গা-ঢাকা দেয়। এখানে বাঙ্গালী পাবেন

কি করে? তবে হ্যাঁ, দু-একটা মাতাগ্রাফ আসে বাঙ্গালী, কিন্তু তাদের যে কি হয় বল্‌তে পারি নে। মাঝে মাঝে শ্যাম-পুলিশ পুরস্কার ঘোষণা করে 'অমুক ভারতীয় পুলিশ নিখোঁজ, কেউ সংবাদ এনে দিলে একশত ডলার পুরস্কার পাবে'। ব্যস্‌, এ পর্য্যন্ত। আর কোনো হদিস পাওয়া যায় না।

—ভারি বিপদের কথা তা হলে।

আমার পেছনে-লাগা স্পাইদের কথা বল্‌লাম না। কার মনে কি আছে বলা যায় না।

—আপনার কোন ভয় নেই। স্পাইগুলা এদেশে এসে বাড়াবাড়ি করে বেজায়, তাই কেউ তাদের ওপর খুশি নয়।

সিন্ধী বৃদ্ধ একজন বল্‌লো—সিঙ্কোরা সেকালে বিখ্যাত ছিল শঙ্খের জন্য। এখন আর তা মিলে না সাগর-তীরে। শঙ্খের জন্যই শহরটার নাম সিঙ্কোরা অর্থাৎ শঙ্খিয়া। আমাদের শঙ্খ কথাটাকে থাইরা উচ্চারণ করে সিঙ্কো। এদের সব কথাই সংস্কৃতকে ভেঙ্গে।

সিন্ধীভায়ারা আমায় একটা সুতী সুট উপহার দিলেন। আমার পরণের সুটটার রং জ্বলে গিয়েছিল। দ্বিতীয় পোষাক আমার ছিল না।

বিদায় বেলায় বুড়ো সিন্ধী জিজ্ঞেস করলেন—সিঙ্কোরা থেকে যাবেন কোথা? ব্যাঙ্ককে কি?

—হাঁ, রাজধানীটা দেখতে হবে।

—জাহাজে যাবেন তো? আমি দেব আপনাকে টিকেট কিনে।

—না, তার দরকার হবে না। যাবো সাইকেলে।

—সাইকেলে? কে দিয়েছে পরামর্শ? সাইকেলের রাস্তা কোথা?

—উত্তর-শ্যামের পাহাড়ে রাস্তায়।

—অমন কাজও করবেন না। যেমন রাস্তা চড়াই-উৎরাই, তেমনি লোকগুলা খুনে! সে পথে মানুষ যায়! তাতে আবার কতকগুলা গুণ্ডা এসে সারা অঞ্চলের মেয়েমোরদকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে রাজার বিরুদ্ধে। এ হলো বিদ্রোহী এলাকা। নিরীহ ভদ্রলোকের বেড়াবার ঠাঁই সে নয়। ভারতের 'খাইবার পাস' দেখেছেন, এ তেমনি বেমক্কা বেভূঁই। ও-পথে গেলে বিপদে পড়বেন। কথা শুনুন।

সিন্ধীরা আমায় চেপে ধরলো মত বদ্‌লাতে। ও-পথে নাকি শ্যাম সরকারের পুলিশও দলে-বলে না জুটে যায় না, তাতেও কত রকমে নাকাল হয়। দেখে-শুনে

সরকার ও-অঞ্চলটাকে শায়েস্তা করবার তোড়জোড় করছে, কিন্তু গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ, উচ্চ রাজপুরুষ কেউ দেবে না সরকারকে সে কাজ করতে। অমন বিপদের মুখে পা-বাড়ানোর চেয়ে নাকি দেশে ফিরে যাওয়া ভাল।

অনেকক্ষণ ভেবে-চিন্তে সায় দিয়ে এলাম তাদের কথায়। মনের ভাব গোপন রেখে। সন্ন্যাসীরা বলেছে ক্ষেপাদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে, সিন্ধীরা বলছে এদের আওতা না মাড়াতে, অথচ হাইজাইয়ের রাজেনবাবু আমার চলার পথের সঙ্গী জুটিয়ে দেবেন বলেছেন। পাডাং বুসারের ডাক্তার-পত্নী সুপ্রভা আমায় বলেছে পায়ে হেঁটে যেতে। মন আমার টানছে ও-মুল্লুকটি দেখতে। এ ছুনিয়াটা এমনি, সবাই মনে করে সে অন্য সকলের চেয়ে বেশি বোঝে। আমিও তা-ই মনে করি, নইলে ভ্রমণ আমার দ্বারা এক-পাও চল্‌তো না।

পরের দিন 'তার' এল হাইজাই থেকে—

"আপনার চলার পথের সঙ্গী ছুটি সংগ্রহ হয়েছে। পারিশ্রমিক দিতে হবে না কিছু।"

ব্যস্‌, আর সময় নষ্ট করলাম না। সিঙ্কোরা থেকে ফিরতি পথে হাইজাই রওনা হলাম। সিন্ধীভায়াদের সঙ্গে দেখা করি নাই। পথে দেখি সিঙ্কোরা লজিং হাউস্‌ তাউকী মশাই হাসিমুখে দাঁড়িয়ে—

মিঃ পর্য্যটক, দেখে যাবেন না ছুটি ভারতীয়ের মৃতদেহ সাগর-জলে ভাস্‌ছে। হাজার হোক আপনার দেশের লোক—হাঃ হাঃ হাঃ···

—আমার তো সময় নেই ভাই। তবে আমি বুঝে নিলাম প্রাণে প্রাণে যে স্বাধীন শ্যামবাসী সত্যই খুন-থাই।

'খুন' কথাটা বাংলা অর্থে ব্যবহার করলাম, তাউকীর বুঝবার কথা নয়।

রওনা হলাম। কিন্তু ভাব্‌ছি লোকটা কি বুদ্ধিহীন, না হৃদয়হীন! স্বাধীন দেশ বলেই কি এমনি বেপরোয়া! তা হলে কি যত উত্তরে যাবো এ-রকমের গুণ্ডামিই বেড়ে চল্‌বে। তা হোক, নতুন কিছু দেখবার জন্যই এত কষ্ট স্বীকার, নতুনকে আমার দেখ্‌তেই হবে।

ফিরে এলাম হাইজাই। আগেকার লজিং হাউসেই উঠলাম। রাজেন ভট্‌চায্‌ সঙ্গী ছুটি পৌঁছে দিয়ে গেলেন। বিশেষ কোন কথা বলেন নাই। যেন থম্‌থমে ভাব। কোন গোপন মতলব নাকি? যা হোক আর ভেবে মাথা খারাপ করবো না।

তরুণ সঙ্গী দুটির নাম বিপুল আর মীভ্। ইংলিশ আর ফরাসী তাদের জিহ্বাগ্রে। শিক্ষায় দীক্ষায় যেন দিক্‌পাল, অথচ পরণে হাফ-প্যাণ্ট যা, তাকে জাঙ্গিয়া বল্লেই চলে। অমন অশোভন নেংটি-পরা কেন ? চুপ করে থাকতে পারলাম না।

—এমন শিক্ষিত লোক হয়ে তোমাদের ভাই কটিবাস অসভ্যোচিত সঙ্কীর্ণ কেন ?

—এটা আমাদের সর্ব্ব-স্বাধীনতার প্রতীক। খুন্-থাইয়ের দেশে এসেছেন, দেখুন শ্যামবাসী কত রকমে সর্ব্ববাঁধনের অতীত। কোনো বাঁধাবাঁধির আলিঙ্গনে আমরা ধরা-ছোঁয়া দেই না। সমাজের বন্ধনকে দিয়েছি মুক্তি, পোষাকটা আর কেন অনাবশ্যক শৃঙ্খল হয়ে নিয়ম-নিগড়ের দাস করে রাখ্‌বে !

—আচ্ছা আমার গাইড্ হবে, অথচ ফী তোমরা নেবে না, এ কেমন ?

—ফী তো আমরা আদায় করে নেব, তবে মুদ্রা বা নোটে নয়।

—কি ফী দিতে হবে তা হলে, আমার সামর্থ্যে কুলোবে তো ?

—কুলোবে বই কি, আপনার যা নেই তা দেবেন কি করে !

—হেঁয়ালি ছাড় ভাই, শাদা কথায় বলো কি দিতে হবে। আমি মুখ্যু মানুষ কিনা, ভাষার প্যাঁচে হতভম্ব হই।

—তবে শুনুন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে আমরা করছি রিসার্চ্চ (গবেষণা) পালি ভাষার। পালি, সংস্কৃত আর ভারতীয় ভাষা, এরা যেন এক পরিবারের সহোদরা। তাই আপনার চলন-বলন থেকে মূল ভাষা-কঙ্কালকে উদ্ধার করতে চাই। যে-টুকু আপনি দিতে পারবেন সে-টুকুই হবে আমাদের গবেষণার বিষয়-বস্তু। কোন সন্দেহ করবেন না, প্রাণের কথাটি বল্‌লাম। কাজেই এটাই হবে আমাদের প্রাপ্য। বেগার খাটছি বলে আপনারও সঙ্কোচ রাখা ঠিক হবে না।

—ব্র্যাভো !

বলে তাদের সঙ্গে কোলাকুলি করে তাদের ভাই বলে গ্রহণ কর্‌লাম।

পাডাং বুসারের স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌টরের মুখে শুনেছি ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির স্বীকৃতি, আর আজ এদের মুখে শুনলাম অন্য কিছু না হোক অন্ততঃ ভারতীয় ভাষাটার কাছে এরা কতদূর ঋণী তার পরিমাণ আবিষ্কারের প্রয়াস।

যা হোক এদের হাবভাবে তো সন্দেহ করবার মত কোন কিছু নজরে পড়লো না। তবে এরা দেখা দিয়েছে রাজেন্ ভট্‌চায-এর মত একজন পাকা কূটনীতিকের মারফত, এই যা।

সন্ধ্যায় এসে তারা নিয়ে গেল আমায় তাদের সভায়। সেখানে রাজেন ভটচায, মিঃ মু, আরো আট-দশজন বাঙ্গালী সহ বসে আছেন। চারদিকে ঘিরে রয়েছে থাই নরনারী, তরুণ-তরুণী। সব নীরব। ব্যস্ততা নাই, কোলাহল নাই। সবাই যেন পথ-নির্দ্দেশ পাবার জন্য সকল অন্তর ঢেলে দিয়েছে নেতৃস্থানীয়ের বক্তৃতায়। বক্তৃতায় ভাবপ্রবণতা নাই, উচ্ছ্বাস নাই।

সেদিনকার শ্যামভাষার বক্তৃতা বেশির ভাগই বুঝি নাই। তবে রাজা প্রজাধিপকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, তা বেশ বুঝেছিলাম। শ্যামদেশের যেটুকু দেখেছি তাতেই বুঝতে আর বাকি নাই যে এখানে জনমত প্রবল, জনগণ স্বাধীন। তবে আজকেকার চল্‌তি তুনিয়ার হিসাবে শ্যামবাসী পায় নাই মুক্ত দৃষ্টি। মান্ধাতার আমল থেকে যে গতানুগতিক ধারা চলে আস্‌ছে, তারই পূজারী তারা। কাজেই অন্ধ-সংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা পরিহার কর্‌তে পারে নাই সব ব্যাপারে।

এ সভার উদ্দেশ্য শুধু প্রচার নয়, গণমত গঠন দ্বারা শ্যামবাসীর জীবনকে শ্রেয়ের রূপে রূপায়িত করা। কর্ম্মী তাদের সংগৃহীত। এ সভা তাদের দিল কর্ম্মসূচী। বিপ্লবের জয়-জয়কারের সঙ্গে সভা ভঙ্গ হলো।

পরের দিন সম্পূর্ণ নিলাম বিশ্রাম। রাত্রি প্রভাতে আমি বিপুল ও মীভ্‌ বেরিয়ে পড়লাম তিনখানি সাইকেলে 'রাজনীতিক ক্ষেপা'দের রাজ্যে। হাইজাই হতে উত্তরাপথে। ঠিক উত্তর নয়, কিছুটা যেন পশ্চিমের কোণ।

মুক্ত সদাব্রতের মাঝে

জনমতের যুপকাষ্ঠ

(শিরশ্ছেদ—অবারিত দ্বার—সাগর-তীর—জেলেগ্রাম—দুর্গম গিরিকানন—লান্ সোয়ান্—ক্রা)

—অন্তিম বাসনা কি তোমার ?

—কিছু না। [চোখে কালো ঠুলি, হেঁটমুখ, ক্ষীণস্বর, পিঠমোড়া বাঁধা হতভাগ্য।

—তবে প্রস্তুত হও প্রাণদণ্ডের জন্য।

খড়্গের ঝলকানি ! নিমেষে ছিন্ন মুণ্ড ধূলায় লুটায় !!

খুঁটির সঙ্গে হস্ত-পদ আবদ্ধ, মুণ্ডহীন ধড় হতে ফিন্‌কি দিয়ে ছোটে রক্ত !

—বাপ রে !···

বলেই তিন লাফে সে স্থান ত্যাগ কর্‌লাম। ছুট্—ছুট্—একেবারে আশ্রয়-কুটীরের নীচে এসে থপ্ করে বসে পড়লাম।

বিপুল ও মীড্ পিছু পিছু এসেছিল। আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্‌ছে। জল এনে ওরা আমার মুখে-চোখে ছিটিয়ে দিল।

··· ··· ···

হাইজাই ছেড়ে সেদিন আমাদের তিন জনের শফর সুরু—ক্ষেপাদের অর্থাৎ বিপ্লবীদের মুলুকে। এদেশের রোদ বরদাস্ত করা যায় না। তাই যাত্রা আমাদের শেষরাতে। শহর ছেড়েই পড়্‌লাম চড়াই-উৎরাই পথে। পথ তবু বেশ প্রশস্ত, দুপাশে অনেক দূর অবধি গাছ-গাছড়া কেটে সাফ্ করে যেন ফুটপাথের মহিমা দেওয়া হয়েছে।

সঙ্গীদের সাইকেল তত ভাল নয়। তাদের মাঝে মাঝে নামতে হচ্ছে বেশি চড়াই পথে। আমার সাইকেলের গিয়ার্ আর মুভিং প্লেট সমপর্য্যায়ে, প্যাডেল্ কর্‌তে আরাম, কষ্ট হয় না। ওরা কিন্তু সে অসুবিধার জন্য সাইকেলের দোষ দেয় না, হাসিমুখে নিজেদের অক্ষমতাই জানায়।

দু'পাশেই উঁচু-নীচু বিস্তর পাহাড়। উঁচু পাহাড়গুলার গোড়ায় আর নীচু-গুলার গায়ে গায়ে পরিত্যক্ত বস্তির আধভাঙ্গা ডেরাডাণ্ডা। টিনের সন্ধানে

একদিন চীনারা দলে দলে এখানে এসে আস্তানা পেতে নিয়েছিল, আজ এ স্থান ছেড়ে দূরে চলে গেছে যেমন সেখানে টিন বা বক্সাইটের সন্ধান পেয়েছে। রাতেও ভাঙ্গা মাচার ওপর ঘরগুলা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

ভোর হয় হয় এমন সময় আমরা চওড়া পথ ছেড়ে গ্রামের দিকে রওনা হলাম; কয়েক মাইল যাবার পরই গ্রামে পৌঁছে গেলাম। ঘরগুলা সবই উঁচু মাচার ওপর। কিন্তু আশ্রায় কোথায়, সব বাড়িরই যে দোর বন্ধ। লোকজন থাকলে সাড়া মিলতো। ঘুরে ঘুরে একটা বাড়িতে গিয়ে একজন লোকের দেখা পাওয়া গেল। সে-ও চট্‌পট্‌ ঝাঁপ বন্ধ করে নীচে নেমে এল। বললো—

—এ গাঁয়ের লোক সব গেছে পাশের গ্রামে। চলুন আমার সঙ্গে। সাইকেল রাখুন খুঁটিতে ঠেঁস দিয়ে। দেখুন এসে আমাদের অবারিত স্বাধীনতার লীলা। চলুন শিগ্‌গীর।

বিপুল ও মীড়্‌কে নিয়ে লোকটার সঙ্গে দ্রুত পায়ে হেঁটেই গেলাম তাদের স্বাধীনতার লীলাটা কি দেখ্‌তে। মনে মনে এঁচে নিলাম বিপ্লবীদের কুচ-কাওয়াজ নিশ্চয়। কিন্তু চম্‌কে উঠলাম পাশের বড় গাঁয়ে পা দিয়ে—এ যে জনমতের যূপকাষ্ঠ। গল্প অনেক শুনেছি, আজ প্রত্যক্ষ দেখ্‌লাম সে নৃশংসতা। কী পৈশাচিক হৈ-হল্লা!—

খড়্গ জল্লাদের করে খেল ঘূর্ণিপাক—ছিন্ন-মুণ্ড, রক্তের ফিনকি !!

... ...

বিপুল আর মীড়্‌এর দেওয়া জলের ঝাপ্‌টায় যেন রক্তের লালিমা ঢেকে বাহিরের পৃথিবী তার রূপের বেসাতি মেলে ধর্‌লো আমার চোখের সমুখে। তারপর বিপুল এনে দিল এক গ্লাস সাম্‌সু মদ।

—ও-জিনিষ আর পান কর্‌বো না ভাই, অনেক কষ্টে ছেড়েছি।

—এ পানীয় নয়, আপনার ওষুধ। ও-সব ভাবপ্রবণতা রেখে দিন। দেহ পটু না থাকলে, রাতে ঘুম না হলে ভ্রমণ করবেন কেমন করে? আমিও নেশার পক্ষপাতী নই। কিন্তু স্নায়ুকে সবল করতে ওষুধের মাত্রায় উগ্র পানীয় গ্রহণ করি।

আর কিছু বলা চলে না, খেতে হলো সামসু মদ, এক চুমুক এক চুমুক করে। হাজার হোক এরা এদেশের আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চল্‌তে জানে।

মীড্ এরি মধ্যে জোগাড় করে এনেছে একটা মেটে হাঁড়ি আর শাক-সবজি, চাল কিন্‌তে গেল লোকটার কাছে। লোকটা বল্‌লে—

—ভাত আমি চাপিয়েছি। তুমি ভাই শাক-সব্‌জি তৈরি কর।

তা নইলে যে নিষ্ঠুর ব্যাপার ঘটেছে ভোরে তার একটা কথাও লোকটার মুখে নাই। সে যেন নিত্যকার মামুলি ঘটনা।

তারা দুজনে মাচা-ঘরের নীচে লেগে গেল রান্নার ব্যাপারে। মদের নেশায় এতক্ষণে আমার অন্তরে দেখা দিয়েছে অনন্ত জিজ্ঞাসা—যে ভীষণ নরবলি দেখে এলাম তার হদিসের জন্য। বিপুল আমায় সকল বৃত্তান্ত খুলে বল্‌লো, কামনানের কাছে যা শুনেছে।

—যে হতভাগ্য তরুণের শিরশ্ছেদ হয়েছে, সে সেনাদল থেকে পলাতক হয়ে গ্রামে এসে পাগল সেজে ছিল। দুদিনে সে ফাঁকি ধরা পড়ে যায়। তখন চলে গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ সভার বিচার। কামনান, পূজাইবান্, গ্রামবাসী—সকলে একমত হয়ে সাব্যস্ত করে প্রাণদণ্ড।

—শ্যাম-সরকার যদি আপত্তি করে, তখন উপায়?

—সে ক্ষমতা কারু নেই, রাজারও না। আপনি বুঝি আইনটা জানেন না! শুনুন বল্‌ছি। গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ প্রাণদণ্ড সাব্যস্ত করে তখন তখনই সাজাটা দিতে পারে না। আসামীকে আটক রেখে, কামনান প্রাণদণ্ডের লিখিত আদেশ চায় ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে। ম্যাজিষ্ট্রেট নিজে সে আদেশ দিতে পারে না, সে জানায় রাজাকে। রাজাও প্রাণদণ্ডের আদেশ দেবার অধিকারী নয়। তাই আবেদন যায় রাজসভার সর্ব্বোচ্চ বিচারক—ব্রাহ্মণের নিকটে। তিনি লিখিত আদেশে সহি-মোহর অঙ্কিত করে দেন। নইলে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের আদেশ ওল্‌টাতে তাঁরও ক্ষমতা নেই।

দুপুরের আগেই আমাদের খাওয়া-দাওয়া বিশ্রাম সারা। মীড্ বলেছিল এ বাড়িতে রাত কাটানোর সুবিধা হবে না। পল্লীপথে ছায়া আছে, পাশের বড় গাঁ-টায় যেতে হবে। আমরা বেরিয়ে পড়লাম। গ্রামটাও দেখ্‌বো পথও চল্‌বো। লোকটা অতিথি বলে সমাদর করে নাই, বিদায় বেলায়ও করে নাই বাক্যব্যয়। তবে বিরক্ত হয়েছে এমনটিও বুঝা গেল না।

ফাঁক ফাঁক বাড়িগুলা, সব মাচার ওপরে ঘর। মই বেয়ে উঠ্‌তে হয় ওপরে। বাঁশের বেড়া, মাঝে মাঝে কাঠের বেড়া, কাঠের দোরও দেখা

যায়। সব বাড়িতেই কূয়া একটি, দুটি। কিন্তু ঘরগুলার গা ঘেঁসেই এক এক সারি করে গাছ, বেশ বড় সড়। গাছের ছায়ায় ঘরগুলার ভিতর দিনেই আঁধার। স্বাস্থ্যের পক্ষে এ ব্যবস্থা আদপেই অনুকূল হবার কথা নয়।

মীড্ বল্‌লে—গাছগুলা না থাকলে কেউ বাস কর্‌তে পারে না ডাঁশ-মশার দাপটে আর রোদের তাপে।

—তার মানে ? গাছেই তো আরো মশা বাড়ায় হে।

—না, না। এ রাজ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ডাঁশ ঘুরে বেড়ায়, ওরা গাছে বসে না, ঝোপ-ঝাড়ে আর ঘাস-পাতায় বসে বসে খুদে পোকা-মাকড় খায়। তাই বড় গাছ ঘরগুলাকে আড়াল করে মানুষের বাসের যোগ্য রাখে। ঘরে এজন্ত জানলা হামেশা থাকে না।

মীড্ তাড়াতাড়ি নিঃসাড়ে গিয়ে একটা ঝোপের ভিতর হাত গলিয়ে বন-মুরগী ধরে ফল্‌লো। বুঝলাম ওস্তাদ মীড্ রাতের আহারের ব্যবস্থায় সজাগ।

রাস্তার পাশে একটা বড় ঘরের মাচা থেকে ঝুলানো নোটিশ—'এখানে সিঙ্গাপুর ও ব্যাঙ্ককের ইংরেজী দৈনিক বিক্রি হয়।'

কৌতূহল হলো, মই বেয়ে ওপরে উঠে দেখি একটি মহিলা সংবাদপত্র পড়্‌ছেন। তাঁর হাতে লণ্ডনের দৈনিক। শুনলাম নিউ ইয়র্কের সংবাদপত্রও এখানে বিক্রি হয়, তবে সেগুলা চার মাস আগেকার। তাই একটা কিনে নিয়ে এলাম।

তখনো বেলা আছে। এক বাড়ির উঠানে একটা লোক বাঁশের ছেঁচা তৈরি কর্‌ছে মুগুরের ঘায়ে কাটারী চালিয়ে। পাশে বসে আছে শিশু কোলে করে তার স্ত্রী বোধ হয়। মীড্ তাড়াতাড়ি তাদের বড় ঘরে উঠে গেল। কিছুক্ষণ পরে নেমে এসে বল্‌লে—

—এখানেই থাক্‌বো হে বিপুল! ওই ছোট ঘরটায় শোয়া যাবে।

—ঘরে গিয়ে কি দেখে এলে মীড্ ভায়া ?

—অনেক কিছু। ভাতের হাঁড়ি, তরকারির গামলা, ভাঁড়ার—সব।

লোকটা বা তার পরিবার কিন্তু আমাদের দিকে তাকালেও না, বা মীড্ যে তাদের ঘরে অনধিকার প্রবেশ করেছে সেজন্ত ধমক-ধামকও দেয় নাই। তারা যেন নির্ব্বিকার। আমাদের বস্‌তে বলাও তারা দরকার মনে কর্‌লো না।

মীড্ তাড়াতাড়ি কাফি তৈরি করলো। দুধ নয়, শুধু চিনি দিয়ে। সব গ্রামেই কাফি, তামাক, মদ আর চিনি কিনতে পাওয়া যায়। কাফি খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম—ঘরে না ঢুকে ঘরের মালিককে প্রশ্ন করলেই ভদ্ররীতি হতো, না মীড ?

—তা হলে আর আশ্রয় পেতেন না। এ অঞ্চলের নিয়ম যে যার বাড়িতে খুশি ঢুকে হেঁসেল থেকে হাঁড়ি নামিয়ে ভাত তরকারি যা পাবে খাবে। যাবার সময় এঁটো বাসন ধুয়ে রাখবে। কোন কথা জিজ্ঞেস করবে না। বাড়ির মালিকও উচ্চবাচ্য করবে না। অভাব তো এদের নেই।

বিপুল বললে—আরো কথা আছে। এদেশে অতিথি বলে কিছু নেই। সবাই আপন জনের মত। তাই এসে খাবার অনুমতি চাইলে, তাকে পর মনে করে। ভাবে লোকটা আমাদের কাছ থেকে আলাদা থাকতে চায়, তাই অমন লোককে খেতে দেয় না, ঠাঁইও দেয় না।

—বাহবা সাম্যবাদীর দেশ। ভারতে কাশীতীর্থে দেখেছি বহু অন্নসত্র, কিন্তু সেখানে পরিবেশক অন্নসত্রের লোক। ক্ষুধিতেরা আপন হাতে ভাত-ব্যান্নুন তুলে নিতে পারে না। এ-রকম গৃহস্থের ঘরে ঘরে সদাব্রত কোন দেশে আছে বলে জানিনে। সর্ব্ব-স্বাধীন নাম সার্থক।

মীড ভাত চাপিয়ে দিল। রান্না করতে হয় মাচার নীচে বা বাইরে। রান্নার পরে সব মাচা-ঘরে তোলা হয়, সেখানে বসে খাওয়া হয়। কেউ কেউ নীচেই খাওয়ার পাট সারে।

মালিক-পত্নী এসে মীড্কে অনুযোগ দিল—ঘরে ঢুকে তো হাঁড়িতে ভাত সব্জি রান্না করা রয়েছে দেখে এসেছো, তবু যে ভাত চাপালে ?

উত্তর দিলে বিপুল—আমাদের বন্ধুটি বিদেশী, ঠাণ্ডা ভাত খেতে পারে না।

মহিলাটি আর কিছু বললে না। তার স্বামী বাঁশের চোঁগুলা ঘাড়ে করে কোথা নিয়ে গেল। বিপুল বনমুরগীটা এনে আমার হাতে দিয়ে বললে—

—এটাকে হত্যা করবার কাজ আপনার।

আমি সেটাকে হাতে নেওয়া মাত্র মহিলাটি, বিপুল ও মীড্ মুখ ফিরিয়ে রইলো। এটাকে শেষ করতে ছুরি লাগবে না। গলাটা টিপে ধরে এক মোচড়ে মুণ্ডপাত করলাম। তারপর মীডের হাতে ধড়টা দিয়ে বললাম—এবার পালক ছাড়ান তোমার পালা।

মীড ভাত নামিয়ে গরম জল করে রেখেছিল, তাতে পাখীটা ডুবিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পরে অতি সহজে পালক ছাড়িয়ে ফেল্লে। কেটে কুটে রান্না চাগিয়ে দিল—শুধু নুন আর লঙ্কা দিয়ে। কোন মসলা নয়।

আমি বিপুলকে বললাম—আমাদের দেশে দেবতার পূজা ক'রে তার সমুখে খাঁড়া দিয়ে বলি দেওয়া হয় ছাগ-মহিষ হাড়কাটে আটকে। কিন্তু মানুষকে বধ করা আমাদের চোখে বীভৎস। তাই সকাল বেলা শিরশ্ছেদ দেখে বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম।

—আমরা পশুর গলায় ছুরি দিতে পারিনে। ওই একটি কাজে আমরা পরাধীন।

—অথচ গ্রাম্য পঞ্চায়েতের আদেশে অপরাধীকে বলি দিতে তোমাদের বাধে না। ঘাতক তো খাঁড়া বাগিয়েই থাকে, যেন নররক্ত দর্শন না করা পর্য্যন্ত তার স্বস্তি নেই। জানো বিপুল, আমাদের দেশে সেকালে নাকি দেবতার সমুখে নরবলি দেওয়া হতো। আমরা কখনো দেখিনি। তবে অসভ্য নরমুণ্ডশিকারী নাগা প্রভৃতি জাতির ভিতর আজও নরমাংস ভোজন একেবারে লোপ পায় নি।

আধঘণ্টা মধ্যে রান্না হলো। মীড্ কিছুটা মাংস মহিলাকে দিয়ে তার রান্না তরকারি নিয়ে এল। আমরা তিনজনে পরিতোষ করে খেলাম। মাংস রান্না হয়েছিল অতি মুখরোচক। সন্ধ্যা তখন কালো যবনিকা টেনে দিয়েছে। আলো নাই, সংবাদপত্র পড়া হলো না। ছোট মাচা-ঘরটায় উঠে আমরা শুয়ে পড়লাম। আমি মশারি খাটিয়ে নিলাম, মহিলার কাছে চেয়ে একটা বালিশ নিলাম।

বিপুল ও মীড্ মশারি-বালিশের ধার ধারলো না। দু টুকরো কাঠ এনে তাতে মাথা দিয়ে ওরা শুয়ে পড়লো। আমি শুয়ে দেখি পা লম্বা করার জো নাই, বেড়ায় ঠেকে, অগত্যা পা গুটিয়েই ঘুম দিলাম।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন এমনি করেই আমরা গ্রামবাসীর ঘরে ঢুকেছিলাম। তবে বিবাহিতের বাড়িতে আর যাই নাই; শোবার কষ্ট হয়। তা ছাড়া এ মুলুকের রেওয়াজে বাড়িওলার হাঁড়ি মারি নাই, তার কাছ থেকে চাল কিনে আলাদা রান্না করে নিয়েছি। কূয়ার জলে দুবেলা স্নান করেছি বিপুল-মীড্এর মত। এ বড় গরম দেশ। দুপুরে কূয়ার ঠাণ্ডা জলে স্নানে ঠাণ্ডা লেগে যায়, সর্দ্দি হয়।

চতুর্থ দিন আমরা পেলাম আবার সাগরতীর, এটা অগভীর উপকূল। সিঙ্গোরার মত, তবে শহর সে নয়। কিন্তু অষ্টপর সাগরতীরে কড়া পুলিশ পাহারা, কেমন ভয় ভয় করছিল। আমার মুখ-চোখ দেখে মীড্ হেসে বল্লে—

—চীনারা জাঙ্কে (চীনা নৌকা) করে এসে তীরে নামে নানা রকম নিষিদ্ধ পদার্থ নিয়ে, তারপর বেমালুম গা-ঢাকা দেয় বলে ওদের বাধা দেবার জন্য পুলিশ পাহারা।

আমরা গিয়ে উঠলাম গ্রামবাসী এক ভদ্রলোকের বাড়ি। একখানা বড় ঘর, আমাদের দেশের মত করোগেটের চাল, তবে মেঝেটা সিমেণ্ট-করা, করোগেটগুলা সবই বি. ও. সি. মার্কা দেওয়া। ভিতরে কয়েকটা কামরা। সমুখের বড় কামরাটায় আমরা আস্তানা পেতে নিলাম। কামরার এক পাশে ছোট ছোট তিন খানা খাট, অন্য দিকে একটা বড় খাট। মাঝখানে গোল টেবিল, চেয়ার চার-পাঁচ খানি। ঘরের খুঁটিতে খুঁটিতে হরিণ-মুণ্ড কায়দা করে বসানো।

মীড্ আগে যেয়ে কাবার্ড (cupboard) দেখ্‌লো, জালি আলমারা (meat-safe) খুঁজলো। এসে বললে—সের পাঁচেক চিনি আর পাতি লেবু আছে। আমি খুঁজে খুঁজে একটা ছোট আলমারি থেকে খবরের কাগজ বার্ করলাম। সব্ আণ্ডার-গ্রাউণ্ড দলের প্রচার-পত্র। নাম-ধাম-ঠিকানা নাই, শুধু তারিখ। কিছুটা পড়ে পড়ে বুঝলাম চীন, জাপান, মলয় প্রভৃতি দেশের সরকার-বিরোধী রাজনীতিকরাই প্রকাশক। আমাদের দেশে এরকম পত্রিকা ঘরে রাখা মানে জেলখানায় পা বাড়িয়ে দেওয়া। স্বাধীন পরাধীনে তফাৎ কত!

সর্ব্বাগ্রে আমরা স্নান করে নিলাম। ঘরের পেছনে কূয়া, চারদিকে চত্বর বাঁধানো। এক পাশে হাড়কাঠের মত তুটো কাঠের খুঁটির সঙ্গে লম্বা একটা বাঁশ খিল দিয়ে আট্‌কানো। বাঁশটার আগায় দড়ি বেঁধে বালতি ঝুলানো আর বাঁশটার গোড়ায় প্রকাণ্ড একটা পাথর বাঁধা। বাঁশটার মাথা তাই সব সময়ে থাকে উঁচু। বাল্‌তি ধরে টেনে বাঁশের মাথা নুইয়ে কূয়ার জলে বাল্‌তি ডুবলেই ছেড়ে দেওয়া হয়, তখন জলশুদ্ধ বাল্‌তি আপনি ওপরে উঠে আসে পাথরের ভারে।

স্নানের পর সরবৎ তৈরি করে খেয়ে বেরোলাম আমরা। মীড কিনে আনলো চাল, মাছ আর নারকোল তেল। হাঁড়ি, কাঠ ঘরে মজুত ছিল। বেশিক্ষণ ঘোরা গেল না, রোদের গরমে। ফিরতি পথে একটা দোকান ঘরের

সমুখে আঁটা যত রাজ্যের কুৎসিত ছবি। আইনে বা সামাজিক রীতিতে তা নিষিদ্ধ নয়। পাডাং বুসারেও তা নজরে পড়েছিল, সে কথা বলেছি।

খাওয়া হলো। খবর কাগজ পড়লাম কিছুক্ষণ, তারপর তাকিয়ে আছি সমুখের পোষ্টাফিস ঘরটার দিকে।

—কি দেখছেন? পোষ্ট অফিস? এটায় কিন্তু মাইনের পোষ্ট মাষ্টার নয়। গ্রামের কামনানের ছেলে কমিশনে কাজ করে। কামনানের আপন জন সরকারী চাকরি পেতে পারে না, তাই কমিশন বরাদ্দ। মাইনে-করা কেরানি আছে অপর একজন। অফিসের কাজ হয় সকাল বিকাল।

—ভাল কথা। সকল দেশেই বড় চাকুরে বা মুরুব্বিগণ স্বজনকে তাঁর আওতায় চাকরির সুবিধা করে দেন। এ দেশে সেটা বুঝি নেই।

—যে দেশে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট পায় মাত্র আশি টিকেল বেতন সে দেশে সরকারী চাকুরি লোভনীয় হতে পারে না। সিভিল বিভাগের চাকরিগুলা করে বেশির ভাগ অলস মলয়জাতি, যারা খাটুনিকে পায় ভয়। সাতদিন মাছ ধরে বিক্রি কর্‌লে যে পদের মাসিক বেতনের চেয়ে বেশি রোজগার হয়, সে পদের প্রত্যাশা শ্যামবাসী কেউ করে না।

—এটা সুখের বিষয়। আমাদের দেশে চাকরির মোহ। খাটা-খাটুনির কাজ সহজে কেউ কর্‌তে চায় না। অবশ্য ইংরেজের সভ্যতা ও শিক্ষা সেজন্য দায়ী। ইংরেজ চায় দেশবাসীকে সরকারের গোলাম করে রাখতে।

—এদেশে চাকুরি করতে কেউ চায় না, স্বাধীন থাকতে চায়। এই যে বাড়িতে আমরা উঠেছি, এটার মালিক একজন প্রাদেশিক গবর্ণর। তিনি এখন টুর-এ। তিনি পান মাসিক পাঁচশত টিকেল। টুরের খরচও নিজেরই বহন কর্‌তে হয়, সেজন্য এক পয়সাও তিনি বাঁচাতে পারেন না। তাই গবর্ণরের স্ত্রী-পুত্র গেছে স্বগ্রামে। এটা চাষের সময়—চাষের ব্যবস্থা না কর্‌লে, খোরাকের চাল না পেলে, সারা বছর চাল কিনে খাবার মত সামর্থ্য তাঁরও নেই।

—গবর্ণর-পত্নী চাষের কাজ করে?

—থাইরাজ্যের রাজাও বছরে একদিন হাল চাষ কর্‌তে বাধ্য, সমগ্র রাজ্যে নইলে ভাল ফসল হবে না বলে এ রাজ্যে প্রচারিত। ধনী-দরিদ্র সবার এ বিশ্বাস যে নিজের জমিতে নিজে চাষ না করলে পুরা ফসল পাওয়া যায় না। গবর্ণর-পত্নী তো রাজার চেয়েও মানী নয়।

রোদ পড়ে গেছে। বেড়াতে বের হলাম। ঘুরতে ঘুরতে একটা ঘরে গিয়ে আমরা ঢুকলাম। সেটা রিডিং রুম বলে মনে হলো। কিন্তু তা নয়, ওটা নাকি এক-তরুণের বাড়ি, বিপুল বলেছিল। চার-পাঁচটি তরুণ বসে ছিল। টেবিলে অনেকগুলা খবরের কাগজ, আণ্ডার-গ্রাউণ্ড দলের বুলেটিনও।

আমার প্রতি অসংখ্য প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হলো। প্রধান প্রশ্ন—মহাত্মা গান্ধী হাল চাষের কাজে সকলকে না লাগিয়ে চরকা কাট্‌তে দিলেন কেন? আগে অন্ন চাই, পরে তো বস্ত্র? অথচ ভারতে নাকি অনেকে আজও পেট ভরে খেতে পায় না।

আমায় ছোট খাটো একটি বক্তৃতা দিতে হলো। সেই পুরাতন কথা। ভারতে চাষের জমি বৃদ্ধি করা অসম্ভব। জমির মালিক চাষী নয়, খাজনা বা ফসলের অর্দ্ধ জমিদারকে দিয়ে চাষী রিক্ত।

—তোমরা ভাই তোমাদের দেশের অফুরন্ত পতিত জমি দেখে অন্য দেশের ধারণা কর মাত্র মানচিত্র লক্ষ্য করে। আমাদের দেশে পতিত জমি নেই, সব বাস্তু হয়ে গেছে। প্রায় জমিই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, তাতে আধুনিক যন্ত্র সাহায্যে কৃষির উন্নতি করতে হলে বহু টাকার দরকার। সে টাকা জমিদার দেবে না, চাষী কোথায় পাবে? তাই চাষ বাড়ানো হয় না। মহাত্মা গান্ধী সেজন্য চরকা দিয়ে জীবিকা অর্জ্জন ও বস্ত্রে স্বাবলম্বী হবার আশায় সূতা কাটার প্রচলন করেন। যাতে বিদেশী মিলওয়ালা শোষণ করতে না পারে।

রাস্তায় এসে সঙ্গীদের বল্‌লাম—তোমরা বল্‌ছো এটা তরুণের বাড়ি, আমি তো দেখ্‌ছি রাজনৈতিক আলোচনার ক্লাব-ঘর। আমার দেশে হলে ইংরেজের স্পাই এদের নজরবন্দী করে রেখে যখন তখন পুলিশ-ষ্টেশনে টানাটানি করতো। এনার্কিষ্ট বলে, কমিউনিষ্ট বলে। তোমরা ভাগ্যবান। তোমরা জমির মালিক, স্বাধীন মতামতের মুক্ত অধিকারী।

মীড্‌ বল্‌লে—এদেশে প্রকৃত প্রস্তাবে জমির মালিক ষ্টেট্‌ অর্থাৎ জাতি, তবে যে তা চাষ করবে তার খাজনা দিতে হয় না, জমিদারের সঙ্গে ভাগাভাগির বালাই নেই। স্মরণাতীত কাল হতে জমি-চাষের স্বাধীনতা বাধাহীন। রুশ-কমিউনের জন্ম তো সে দিন। ঢের আগে হতেই আমাদের এ রেওয়াজ। কাজেই আমরা নতুন করে কমিউন্‌ গড়বো কেন? আমাদের সর্ব্ব-ব্যাপারে স্বাধীনতা কমিউনিষ্টদের চেয়ে বেশি, আমাদের ডিক্‌টেটরের প্রয়োজন নেই।

আমাদের এই যে সর্ব্ব-স্বাধীনতা, একেই আপনারা পরাধীন দেশের লোক বলে থাকেন এনাকিজম (অরাজকতা), আর পরাধীন দেশের বিদেশী শ্বেত-সরকার বলে বিদ্রোহ।

বিপুল বল্লে—তা হলেও একটা কথা মানতে হবে যে, মোটা ভাত মোটা কাপড়ে তৃপ্ত বলেই শ্যামবাসী সর্ব্ব-স্বাধীন। বিলাসিতার মোহ এলে আপনার দেশের মত ধনিকের সৃষ্টি হতো, যা এদেশে আদপেই নাই। সবাই খেটে খায়। রুশ-সোভিয়েটেও তো তাই।

রাতে সংবাদপত্র পড়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম আসে না। কমিউন্ গড়ার কথা ভাব্ছি। যে দেশে ঘরে ঘরে 'ধর্ম্মগোলা' সে দেশে আর বারোয়ারি ধর্ম্মগোলার কি প্রয়োজন! যে দেশে জনমত অপরাধীকে দিতে পারে চরম দণ্ড, রাজার আচরণ-বিরোধী হয়ে তাকে শায়েস্তা কর্তে উদ্যত, সে দেশে ডিক্টেটর খাপ খায় না—জনমতই সেখানে ডিক্টেটরের পদ জুড়ে বসেছে। লোকগুলার মুক্তদৃষ্টি না থাক, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্য সূক্ষ্ম না হোক, জনমতের মর্য্যাদাই শ্যামকে সব্‌সে সেরা স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করেছে।

ভোরবেলা উঠে আমরা রওনা হলাম সাগরতীরের জেলে-গ্রামে। ঢুকলাম এক বাড়িতে—সেটা বিপুলের বন্ধুর আবাস। বন্ধুটিও প্রায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করলো ঘরে, তার মাছের ব্যবসার কাজ চুকিয়ে। নোট ভর্ত্তি ম্যনিব্যাগ সে ছুড়ে ফেল্লো ঘরের বিছানার ওপর। বিপুল সম্ভাষণ জানালো—

—উত্ত, এই গ্যাখ অতিথি নিয়ে এসেছি ভারতবর্ষের লোক!

—বেশ তো ভাই, থাক এখানে। ক'টা দিন মজা করে হৈ-হল্লায় কাটিয়ে দি।

—কেন, মজা তোমার কমে গেল কি করে?

—জানো না বুঝি, বিয়ে করেছিলাম গেল বছর, বউটা গেছে পালিয়ে।

—যাক্ ল্যাঠা চুকে গেছে, এখন আর তোমার বাড়ি ঢুক্তে 'কিন্তু' হবে না। বউটা পালালো কেন, তোমার গায়ের মাছের গন্ধে বুঝি?

—সে কথা পরে হবে। সিলোন টি আছে, আগে চা তৈরি করো, তোমরা না খাও আমার তো খেতে হবে।

আমি মুখ খুল্লাম—পর্য্যটককে বিষ দিলেও খাবে, চা তো সঙ্গের সাথী। জানো ভাই উত্ত, বিপুল আমায় কিছুতে খালি পেটে চা খেতে দেয় না। আগে দেয় ফেন-ভাত। আমি কি শিশু?

উত্ত বেশ ভদ্রতা জানে, সে জবাব দিলে—আপনি থাইদের ছোট ভাই, কারণ থাইরা স্বাধীন, ভারত সবে সে পথে এগোচ্ছে। তাই ছোট ভাইয়ের খবরদারি থাইরা তো করবেই। বিশেষ করে বিপুল হলো জাতির অনাগত-মূর্ত্তি।

হঠাৎ উত্ত থেমে গেল। মাড-এর ইঙ্গিতে বোধ হয়। আমি একটু অপ্রস্তুত বোধ করলাম।

ততক্ষণে চা এল। বলা বাহুল্য প্রস্তুত-কারক মীড্। বিস্কুট, মাখন আর সংরক্ষিত সারডিন্ মাছ। চায়ের পর চল্‌লো সিগারেট। উত্ত তার বউয়ের কাহিনী বলে চল্‌লো।

—বউটা ছিল শহুরে, শিক্ষিত, রান্না জান্‌তো না কিছু। কিন্তু হালচাষের কাজে ঝানু। তা হলে কি হবে, ঘরে তার মন বসে না আদপেই। বৃষ্টির সময় বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে জলধারা নেবে মাথায়, তবু সাগরের ত্রিসীমায় যাবে না, তীরের হাওয়ায় নাকি তার মাথা ধরে। আমার কাজ তো সাগরে, নদীতে।

—তবে কি মেয়েটা হূণ জাতের ? [মীড্ জিজ্ঞাসা করলে।

—হতে পারে। আর শহুরে মেয়ে বিয়ে করছি নে।

বিপুল ঠাট্টা করে—এ গাঁয়ে বুঝি মেয়ে নেই, সবগুলাই মোরদ।

—এ গাঁয়ের মেয়েগুলার কথা বলো না, ছিঁচকাঁদুনে আর স্বামীর কাছা ধরে চল্‌বে, তাদের যেন পৃথক সত্তা নেই। এমন অনগ্রসর আমার ভাল লাগে না। মেয়েরা হবে স্বাধীন, পুরুষের চেয়েও বেশি, তবে না খাপ খাবে আমার সঙ্গে। আমি হলাম প্রকৃত খুন্-থাই, কোন রকম বিধি-নিষেধ মান্‌তে রাজি নই। আমার খুশি আমি গৈরিক ধারণ করে মঠে যাবো, আর বউটা এসে পা ধরে কাঁদবে—আরে ছি! আমার মা যখন মঠে চলে যেতেন বাবা একটুকুও দুঃখ করেন নি, আবার বাবা যখন যেতেন মাও হা-হুতাশ করতেন না, একবার দুবার নয়, বাবা সন্ন্যাসী হয়েছিলেন চারবার। স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদে এ গাঁয়ের মেয়ে-মোরদ একেবারে জীয়ন্তে মরে যায়—ঠিক যেন চীনা। ওসব সহ্য হয় না।

মনে মনে বিশ্বকবির বাণী আওড়ালাম—

'হেথা হতে যাও, পুরাতন,
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।
আবার বাজিছে বাঁশি আবার উঠিছে হাসি,
বসন্তের বাতাস বয়েছে।'…

—তবে তোমার উচিত ছিল তোমার শহুরে স্বাধীন বউকে নিয়ে বনে বাস করা। বনে সে মনের আনন্দে থাকতো, জংলী মেয়ে কিনা, নইলে মাথা পেতে স্বেচ্ছায় বৃষ্টি নেবে কেন !

—বনবাস কি করে হবে। বনে কি মানুষ থাক্‌তে পারে। আর আমার তো জন্মই বল্‌তে গেলে সমুদ্রে, সমুদ্রেই হবে জীবনের শেষ, অন্য কোথাও নয়।

—তা হলে ভুলে যাও শহুরে বউকে। মৌকোটাকে বিয়ে করে তার সঙ্গেই প্রেম করো। আর তোমার তো সেনাদলে যাবার দিন এসেছে।

—হাঁ, আর দুমাস বাকি।

—তা হলে সৈনিকের ট্রেনিং দু' বছর পার করে এসে জেলে বা মাঝির মেয়ে বিয়ে করে সুখে থেকো।

আমার জানতে ইচ্ছা হলো এ অঞ্চলের মেয়েরা এতটা স্বামীর ওপর নির্ভর করে কেন, থাইরাজ্যের অন্য কোথাও তো এমন নয়। জবাব দিলে বিপুল।

—এ হবার কথাই। এখানকার নারী এতটা স্বামীর উপার্জ্জনের ওপর ভরসা করে থাকে যে, স্বামীর বিচ্ছেদে অচল হয়ে পড়ে। এদের চাষের জমি নাই। চাষ এরা পছন্দও করে না। যেমন আমরা পারিনে জলে জলে নৌকা চালিয়ে মাছ ধর্‌তে, দুদিনে শরীর অপটু হয়ে যায়। আর জেলেরা যদি চাষী হয়, মাছ ধর্‌বে কে সারা বছর ?

—উত্ত কি সমুদ্র ছেড়ে চলে যাবে সৈনিক হতে ?

—সারা জীবনের জন্য নয়। সামরিক শিক্ষা শেষ হলে চলে আস্‌বে। যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় আবার সরকার থেকে আদেশ এলেই যেতে হবে। নইলে জেলের পেশায় থাক্‌বে। এ নিয়ম শ্যামবাসী তরুণের পালন করতে হয় বয়স যখন উনিশ-কুড়ি। কেউ রেহাই পায় না। যদি কেউ পলাতক হয় তবে শিরশ্ছেদ, তা তো আপনি স্বচক্ষেই দেখে এসেছেন।

এবার পথ নাকি দুর্গম, যেমন পাহাড় তেমনি গহন বন। আরো দুদিন বিশ্রাম করে আমরা যাত্রা কর্‌লাম সে পথে। পথ সে নয়। কোন প্রকারে সাইকেল হাতে টেনে চলা, তাও সময় সময় বেতের আঁকড়ি বা বাঁশঝাড়ের অসংখ্য কঞ্চির আলিঙ্গনে বন্দী হতে হয়।

এও ছিল ভাল, এর পর এল যেমন চড়াই তেমন গভীর জঙ্গল। বিরাট বিরাট গাছ নাম-না-জানা, ঝোপ-ঝাড়গুলা কাঁটা-বন। তারই ভিতর ঝাঁকে

ঝাঁকে বাদল-ধারা এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে কিছুটা। আবার ঝড়-ঝাপটা ছুট্‌লো— তবে তা শুধু অতিকায় বৃক্ষশির নিয়েই ঢেউ খেল্‌ছে—মাঝে মাঝে মড় মড় শব্দে মোটা মোটা শাখা ভেঙ্গে পড়ছে, কিন্তু আমাদের গায়ে ঝড়ের আঁচও লাগে না। শুধু সাঁই-সাঁই-বোঁ-বোঁ-মড়-মড়াৎ শব্দ।

পথরেখাও আর নাই। যে একপেয়ে পথ ধরে এসেছি সেটা একটা পাহাড়ের খাড়া গায়ে শেষ হয়েছে। তবে খাড়া গায়ে আছে আট-দশ হাত উঁচুতে একটা মোটা গাছ, তারই শিকড় ধরে উঠ্‌তে হলো। সাইকেলে দড়ি বেঁধে সঙ্গীরা টেনে তুল্‌লো। পাহাড়ের ও-পিঠে আবার একপেয়ে পথ।

আবার খানিকটা যাবার পর আরেকটা প্রাচীরের মত খাড়া পাহাড়—মোটা গাছ নাই যে শিকড় ধরে ওঠা যায়। পাহাড়টার গায়ে মোটা মোটা পেরেক দুটো করে বসানো হলো, চার হাত উঁচুতে, সে পেরেকে দাঁড়িয়ে আবার দুটো পেরেক পোঁতা হলো আরো চার হাত উঁচুতে। এমনি করে প্রায় তিরিশ ফুটেরও বেশি উঁচুতে উঠে তবে আবার পথ পাওয়া গেল। বলা বাহুল্য সাইকেল বেচারাদের তুলতে হলো দড়ির ফাঁসে ঝুলিয়ে, আমাদের লাটবহরের ঝোলাটাও, যা মীড পিঠে করে এনেছে।

সে পাহাড়টা লম্বা, অনেকটা দূর যাবার পর উৎরাই। এবার কিন্তু গাছের শিকড় আর নাক-বার-করা বিরাট পাথরগুলাই হলো সিঁড়ি, যদিও ধাপ একটিও তিন হাতের কম নয় উচ্চতায়। বৃষ্টিতে পিচ্ছিল, পাহাড় গায়ের পাথর ছাড়া ধরবার কিছুই নাই, সে এক বিষম সঙ্কট।

যাক্‌, সে সঙ্কট পার হয়ে এসে পেলাম গ্রাম। বাড়ির সংখ্যা পঁচিশখানার বেশি নয়। ঝড়-বৃষ্টির দরুণ কেউ ঘরের বার হয় নাই। বেছে বেছে অপত্নীকের বাড়িতেই ঢুক্‌লো সঙ্গীরা। দুটো পাতকূয়া—একটায় অবিরাম জল উপ্‌ছে উঠে চারিদিকে গড়াচ্ছে, আর একটায় আট-দশ হাত নীচে জল। বাড়ির মালিক শুধু একটি কথা বল্‌লে—কূয়োর উপ্‌ছে পড়া জলে স্নান করো না। স্নান কর্‌বে গভীর কূয়োর জলে।

ব্যস্‌, মুখ বন্ধ করে সে গিয়ে মাচা-ঘরে উঠে বসলো। রান্না হলো, খাওয়া হলো। কেউ শুয়ে পড়লো না, বসেই রইলো। আমিও মাচার জানালার ধারে মাদুর পেতে শুয়ে শুয়ে সংবাদপত্র পড়তে সুরু কর্‌লাম।

কখন্‌ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। উঠে দেখি সন্ধ্যা। তবে ক্লান্তি দূর হয়েছে।

—আর ক'দিনের পথ ক্রা ?

—ক্রা ঢের দূরে। সবে তো যাত্রা আরম্ভ। দূরত্বে আমরা দশ মাইলের বেশি আসিনি, শুধু পাথর আর গাছের শিকড় নিয়েই করেছি হাতাহাতি। এমনিধারা পথে আরো তিন দিন চল্‌লে পরে পাবো সাইকেল চালাবার রাস্তা।

—পথ-কষ্ট, নইলে জায়গাটা আরামের, গরমের বাড়াবাড়ি নেই।

—বেশ তো, আরামে কাটান দুটো দিন।

বলেই মীড্‌ এগিয়ে দিল সিগারেট, থলে থেকে বার করে।

—দেখুন, ভাই, রাজার কি জুলুম! এদেশে সিগারেট ফ্যাক্টরী আমাদের খুল্‌তে দেওয়া হবে না, পাছে ইংরেজ-আমেরিকান ব্যবসার ক্ষতি হয়। মজা দেখুন।

গৃহের মালিক এতক্ষণ চুপ্‌চাপ ছিল, এবারে ফোড়ন দিল ভাবে-কম্পিত কণ্ঠে—দিনটা তোমরা স্থির করে ফেল, য়্যাংলো-আমেরিকান্‌ ট্রেচারি (ষড়যন্ত্র) আর সওয়া যায় না। সবাই ক্ষেপে হন্যে হয়ে আছে, একেবারে স্বাধীনতা ঘোষণা কর্‌তে, রাজার আওতা কাটাতে।

লোকটার গায়ে চর্ম্মরোগ, দাঁতগুলা পান খেয়ে খেয়ে খয়েরি, পরণের ধুতি তো নোংরা নেংটি, কিন্তু মুখে চোস্ত ইংরেজী ভাষা আর স্বাধীনতার বুলি। আবার দেখলাম তার ঘরে বড় বড় বই দুখানা—ভূচিত্রাবলী, ফরাসী আর ইংরেজী। আমাদের দেশে যেমন রামায়ণ মহাভারত, ওদের সবারই ঘরে তেমনি য়্যাটলাস্‌।

পরের দিন গেলাম আমরা অপ্রশস্ত নদীটায় স্নান করতে। স্রোতের জল পেলাম অনেক কাল বাদে। দেশের কথা মনে পড়ে গেল। বেশ করে সাঁতার কেটে আশ মিটিয়ে নিলাম। সঙ্গীরা কিন্তু ডুব দিয়েই উঠে গেল।

একটু দূরে নদীর বাঁকে কি একটা পদার্থ ঠিক শুশুকের মত ডুব দিচ্ছে আর উঠ্‌ছে। দেখ্‌তে হলো। গেলাম জলে জলেই, কত মাছ এসে গায়ে-পায়ে ঢুঁ মারলো, তবে বেশি বড় তারা নয়, আকৃখুটেও তেমন নয়। লক্ষ্যের কাছে গিয়ে দেখি তরুণী একটি ডুবে ডুবে টিন-টুকরা তুল্‌ছে। তীরে জড়ো করেছে নারকোল মালায় প্রায় সেরখানেক মোটা দানার টিন ওর্‌, দাম যার একশ' টিকেলের কম নয়।

—এত টাকা দিয়ে কি বেসাত কিন্‌বে সুন্দরী? তোমার দেশে তো গোলাম কিন্‌তে টাকা লাগে না?

তরুণী কোন জবাব দিল না, আবার ডুব, আবার ডুব। টিনের ওর্ আর একটা হাতে করে উঠে আমার দিকে মুখ ফেরালো—কী?

দ্বিতীয়বার প্রশ্ন আওড়ালাম।

—তোমার জন্ত কফিন্ কিন্‌বো!

—বহুকাল পরে এ ভবঘুরের মিল্‌লো একটি হিতৈষিণী, যিনি কফিন্ দান করেও আমার অন্তিম-শয্যাকে করবেন আভিজাত্য-পূর্ণ।

তরুণী হয়তো বুঝ্‌লো না কথাগুলা! আমি আর এক ধাপ এগোলাম।

—কিন্তু কফিনের মূল্য এ টিনগুলা যদি ছিনিয়ে নি?

ফস্ করে সে কোমরবন্ধ হতে বার কর্‌লো লম্বা ছোরা একখানা, সেজন্য বোধ হলো সে আগে হতেই তৈরি ছিল। আমি আর কথাটি না বলে চলে এলাম।

তীরে উঠ্‌তেই সঙ্গীরা বল্‌লে—হুঁশিয়ার ভাই, থাই-নারীর সঙ্গে কখনো মশকরা কর্‌বেন না। ছোরার ঘায়ে প্রাণ হারাবেন। আমাদের দেশের মেয়েরা ছোরা কাছে এসে বসায় না, ইতালীর জিপ্‌সিদের মতো দূর থেকে ছোড়ে, তাতে শূকর পর্য্যন্ত ঘাল হয়, মানুষ তো কোন্ ছার্! এটা চীনও নয়. ভারতও নয় যে নারী বিলাসের পণ্য হবে মূল্য-পণে, থাই-নারী স্বাধীন কিন্তু ব্যভিচার করে না। মশ্‌করাকে তারা ঘৃণা করে। এদেশের পতিতার ভিতর থাই-নারী নেই একটিও।

—এমন ছোরা খেলা ইস্কুলে শেখানো হয় বুঝি?

—না, এরা রান্নাবান্নার মত নিজে-নিজেই শেখে, তাই স্বাধীনভাবে একাকী বনে-বাদাড়ে-পাহাড়ে আনাগোনা করে নির্ভয়ে ছোরাখানা আঁচলে ঢেকে।

পরের দিন আবার পথ-যাত্রা। এবারকার পথ অভাবনীয়, এমন পথে ভ্রমণ জীবনে এই প্রথম। পথ তো নয়, সে হলো একটা পাহাড়ে সরু নদী, ছু'পাশে শত শত ফুট উঁচু পাহাড়, তাতে যত রাজ্যের বন-বনানী, দিনেই সে নদী-পথ ছায়া-ঢাকা অন্ধকার। নদীটা পাহাড়ে ঝরণার ধারা, জল কোথাও দু-তিন ফুটের বেশি নয়, তবে স্রোত বেশ জোরালো।

সাইকেলকে টেনে নিয়ে সে পথে যেতে, চড়াই-উৎরাই নামতে-উঠ্‌তে দম বেরিয়ে যায় পঁচিশ হাত চলতে। থেমে থেমে জিরিয়ে, তবে পা-দুটো দিয়ে

জল সজোরে ঠেলে ঠেলে এগোতে হয়। এ অঞ্চলের লোক হামেশা এমন বিকট পথে চলাফেরা করে কি ক'রে মাথায় এল না। দেশে আমরা বর্ষায় মাঠ-ঘাট প্লাবিত হলে ডুবো পথে যাই বটে, কিন্তু আট-দশ হাতের বেশি একসঙ্গে জলা পেরুতে হয় না। এরকম স্রোতও থাকে না।

অনেকক্ষণ বাদে দেখা গেল একখানি ঘর—চারদিকে গাছের সারি ঘেরা। মালিকের যেন সূর্য্যালোকের সঙ্গে অসহযোগ। পাশে একটা মোষের খাটাল। মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি দিয়ে বেড়া—তাতে আবার কাঁটা তার জড়িয়ে একেবারে কলকাতার পুলিশের ব্যারিকেড্ তৈরি করা। বুঝলাম দুরন্ত জানোয়ারের নিরোধ-ব্যবস্থা।

—এ অঞ্চলে তা হলে বাঘ বেশি ?

—হাঁ, তাই তো সারা পাহাড়ে মুলুকে মাচা-ঘরে বাস।

ঘরের কাছে পৌঁছেও আর মই বেয়ে ঘরে ওঠবার ক্ষমতা কারও ছিল না, উঠানেই বসে পড়তে হলো। বিশ্রাম করে স্নান কর্‌তে গেলাম হ্রদে। হ্রদটা বেশি বড় নয়, মাঝখানে পদ্মবন, মনে পড়ে গেল কাশ্মীরের ডাল হ্রদের কথা। তবে আকারে এটা নেহাৎই ছোট :

জলে কিন্তু মাছ নাই। মীড্‌কে একটা পদ্ম আন্‌তে বল্‌লাম, সে রাজি হলো না, আমায়ও যেতে দিল না। ওখানে সাপের ভয় নিশ্চয়। বিপুল বল্‌লে—

এটা আগে ছিল টিন খনি, সব টিন তোলার পর তলা থেকে জল চুঁইয়ে উঠে হ্রদ বানিয়ে ফেলেছে। মোষ পালবার জন্যে এ হ্রদে একরকম গাছের ছাল (তাপিওকা) ফেলা হয় যাতে মোষের গায়ের সব রকম জোঁক-পোকা মরে যায়। জঙ্গলে ঘুর্‌লে মোষের দেহের মত পোকা-উকুন প্রভৃতির আক্রমণে মানুষেরও অতিষ্ঠ হতে হয়। এ জলে স্নান কর্‌লে সে দায় হতে উদ্ধার পাওয়া যায়।

পরের দিন আবার তেমনি নদীতে হেঁটে দু' মাইল অগ্রসর হবার পর পেলাম নদীটার উৎস মুখ। উঁচু পাহাড়টার গা বেয়ে ঝরণা নেমে যেখানে তলায় পড়েছে, সেখানে হয়ে পড়েছে চওড়া একটা জলাশয়। তারই জল উপ্‌ছে হয়েছে নদীটা। ঝরণাটা আজও জল যোগাচ্ছে, তাই নদীটা মজে যায় নাই। হ্রদে মাছ, অনায়াসেই ধরা যায়, সঙ্গীরা বল্‌লে—এ মাছ খেলে নাকি ম্যালেরিয়া হয়। কারণ এ মাছের প্রধান আহার মশা ও মশার ডিম।

এখানে আর বেশিক্ষণ বিশ্রাম করা হলো না। জলাশয়ের তীর দিয়ে পাহাড়ে ওঠবার একটা সরু পথ। সহায়ক গাছের শিকড় ও পাথর। অতিকষ্টে পর্ব্বতের সঙ্গে ঘণ্টা দেড়েক কসরৎ করার পর ওপরে ওঠা গেল। আঃ প্রাণ জুড়িয়ে গেল। মনে হলো স্বর্গরাজ্য বুঝি হাতে পেয়েছি। কিন্তু আকাশ-বাতাস স্নিগ্ধতা দিলেও পথ নাই, অপথ। শ্রান্তিতে যখন দেহ ভেঙ্গে পড়ে, তখন পাওয়া গেল একটা বৌদ্ধ মঠ। তখন প্রায় সন্ধ্যা। মঠে মানুষ নাই আছে মোমবাতি। কাজেই আঁধারে কাটাতে হলো না। খাওয়া ভালই হলো সঙ্গের চাল আর সব্‌জি দিয়ে।

রাত্র কাটিয়ে পরদিন আবার সে পথে। এবার গ্রামগুলা যেন খুবই চট্‌পট্‌ এসে ধরা দিতে লাগ্‌লো। আমরা ক্রমাগত গ্রাম পেরিয়ে গেলাম। এবার রাস্তা পাওয়া গেল তবু সাইকেল চালনার। পথকষ্ট অনেকটা কমলো। একদিনে চল্লিশ মাইল পথ অতিক্রম কর্‌লাম।

বিপুল বল্‌লে—লান্‌ সোয়ান্‌ দেখা দরকার। যাবেন্‌ কি ?

—এ কথা জিজ্ঞেস করছো যে ? দেখার যা আছে সবই দেখ্‌তে হবে। আর লান্‌ সোয়ান্‌ কয়েদখানা বলে নাম শুনেছি।

—পথটা বড় খারাপ. পথ নাই। সেজন্য বল্‌ছি।

—তা হোক, যে পথে এলাম তার চেয়েও কি খারাপ ?

—সে এক রকম, এ অন্য রকম। পাহাড়ে নদী একটা পার হতে হবে, তাতে সেতু নেই।

—সে বুঝ্‌বে তোমরা, আমি তো দর্শক মাত্র।

—বেশ, কালই সে পথে যাত্রা কর্‌বো।

প্রথম দিনেই আবার চড়াই ঠেলতে হলো। তার পর বড় রাস্তা ছেড়ে একপেয়ে পথে নামা গেল। ক্রমে সে পথরেখাও মিলিয়ে গেল জঙ্গলে। আর চারধারে এত জঙ্গল আর হাজার হাজার জোঁক যে কোথাও চুপ্‌ করে জিরোতে বসা দূরে থাক্‌, দাঁড়ানোও যায় না এক মিনিট, অমনি জোঁকগুলা জুতা বেয়ে এসে পায়ে কামড়ে ধরে। ফর্‌সেপ ছাড়া তাকে টেনে ছাড়ানো যায় না পা থেকে। আমার সাইকেলের বাক্সে ছিল ফর্‌সেপ, কাজে লেগে গেল।

সন্ধ্যার বেশি দেরি নাই, অথচ এ পাহাড়টা পার না হলে নাকি আশ্রয় মিল্‌বে না। সারাদিন খাওয়া নাই, শরীর অবসন্ন, সাইকেল টানতে প্রাণান্ত। এমন

সময় পড়লো সমুখে গিরি-খাত। অতি গভীর কিন্তু চওড়া মাত্র তিন-চার হাত। সে খাত পার না হয়ে ঘুরে যেতে হলে সন্ধ্যার আগে ওপারের গাঁ-টায় পৌঁছা যাবে না, অনেকটা রাস্তা ঘুরতে হবে। সাঁঝের সময় আবার হিংস্র জন্তুর হানা।

বিপুল আর মীড্ গলা ছেড়ে 'হ্যাই হ্যাই' চীৎকার করতে লাগলো। কারু সাড়া নাই। ওপারের পল্লীটার একখানা মাচা-ঘর দেখা যাচ্ছে। ওটার নাম শিলাপং। তখন তিন জনে মিলে সাইকেল বেল্ বাজাই আর হৈ-হল্লা করি। বেলা যায় যায়। রাতে দুরন্ত জানোয়ারও দেখা দেয়, গাছে চড়ে রাত কাটাতে আবার সাপের ভয়। আমাদের চোখের সামনেই একটা ফণধর ছুটে এসে তর্‌তর্ করে একটা বড় গাছে উঠে গেল অবলীলাক্রমে। একটু পরেই গাছের ওপর কিচির মিচির পাখীর কলরব।

বিপুল বল্‌লে—সাপটা পাখীর ডিম খাচ্ছে নিশ্চয়।

আমরা আবার হৈ-হল্লায় মন দেই। এরি মধ্যে সাপটা নেমে এসেছে, আমাদের ভয় দেখাচ্ছে ফোঁস্ ফোঁস্ করে। বিপুল অমনি রিভল্‌বার বার করে গুলী ছুড়লো। সাপটা তিন টুক্‌রো হলো, ন্যাজটা তখনও মোড়াচ্ছে।

এবার পিস্তলের আওয়াজে বোধ হয় ওপারের পল্লী থেকে দুটো লোক এল বন্দুক হাতে। তারপর ব্যাপারটা বুঝে আমাদের অপেক্ষা কর্‌তে বল্‌লে। তারা বয়ে নিয়ে এল পাঁচ-ছ হাত লম্বা গোটা চারেক বাঁশের টুকরো। হাতের কাটারী দিয়ে ঝোপ থেকে মোটা মোটা লতা কেটে এনে বাঁশ চারটেকে অষ্টেপিষ্টে বেঁধে বানালো খাত পার হবার সেতু। বাঁশের সে সেতু পার হওয়া চারটে-খানি কথা নয়। একটা বাঁশ একটু সরু, পায়ের চাপে দেবে যায়। পা ফস্‌কালে আর কথা নাই, সশরীরে পাতাল-প্রবেশ। অতি সন্তর্পণে ধুক্ ধুক্ প্রাণে পার হলাম, হাঁপ ছেড়ে সাইকেল নিয়ে ওদের ঘরে গিয়ে নিলাম আশ্রয়। লোক-গুলা যে ক্যান্‌চি নান্‌চি করে কথা বলে কিছু বোঝা যায় না। আমার কানে বাজ্‌ছে যেন মলয় ভাষার সঙ্গে চীনা-উড়িয়া-বুলি সন্ধি করে এ বিকট লব্‌জ তৈরি। বিপুলও বোঝে না। আমাদের দোভাষী হলো মীড্। খাবার ওরা দিলে বাঁশের চোঙে রান্না ভাত আর মাংস—শিক কাবাবের মত। কিসের মাংস জান্‌তে ইচ্ছা থাক্‌লেও প্রশ্ন করি নাই। মনে হলো খরগোস কি সজারুর মাংসই হবে।

এত শ্রান্ত ছিলাম যে ঘুমে চোখ বুজে আসে। আর বচসা না করে শুয়ে পড়লাম লাটবহরের থলেটাকে বালিশ করে। পরের দিন বিশ্রাম। মোড়ল

এলো। সে দু-একটা ইংরেজি শব্দও বল্‌লে! বর্ম্মীদের সঙ্গে লড়াই করতে তারা তৈরি। এখন হুকুমদারেরা হুকুম দিলেই হয়।

বিপুল তাকে বুঝিয়ে দিল লড়াই বর্ম্মীর সঙ্গে এখন নয়, এখন আপন ঘর গুছিয়ে নিয়ে তারপর। সব বুঝিয়ে দেবার পর মোড়ল বল্‌লে—আমরা তৈরি, যখন খবর দেবে তখনই আমরা কাজে লেগে যাবো।

আরো ঢের কথা হলো, সেকালের কাহিনী জানালো—স্থখো থাই রাজ্যটা ছিল আমাদের, এখনো উত্তরে আছে নয়া স্থখো থাই শহর।

আমাদের রাস্তার পাহাড়ে নদীটা পার হবার কথা তুল্‌তেই বল্‌লে—কাল যাবে তো, আমি নিজে সব ঠিক করে দেবো।

পাহাড়ের গায়ে একটা ঝরণা তাতে আমরা স্নান করে এলাম। মগ ডুবানো যায় না, অথচ কি তোড়। নীচে চেয়ে দেখি একটা পুকুর যেন। ওটাতে মাছ আছে, কারণ শুধু ঝরণাটার জল নয়, নদী থেকেও জুলি এসেছে। তার ধারে কলাগাছ দেখলাম। সেখানে মাছ ধরছে ক'টা লোক জুলিতে।

দুপুরে খাওয়া হলো মাছ-ভাত, আর কি চাই। এদের দেখলাম তাজা মাছ কুটতে কি রান্না করতে আপত্তি নাই। রাত কাটিয়ে পরদিন আমরা বেরোলাম।

মণ্ডল আর একটা লোক নিয়ে সঙ্গে চল্‌লো, হাতে তাদের বাঁশের গোঁজ কয়েকটা, যার এক মুখ চোখানো, কাটারীও রয়েছে। এ সব কেন বুঝলাম না। এদের পল্লী থেকে পশ্চিম মুখে অনেকটা পথ উৎরাই নেমে পাওয়া গেল নদীটা যেখানে প্রশস্ত, স্রোত কম। এখানে নদীতীরও নীচু। নইলে পাহাড় কেটে যেখানে নদীস্রোত বয়ে যায় সেখানে লতার বুনট-করা সেতু ছাড়া উপায় নাই, সে বড় দুঃসাহসিক ব্যাপার।

মোড়ল গিয়ে গোটা দশেক কলাগাছ কেটে নিয়ে এল। বাঁশের গোঁজ ঠুকে ভেলা তৈরি করলো, এক পাল্টা কলাগাছ দিয়ে নয়। এক পাল্‌টা ভেলা তৈরির পর, তার ওপর এড়োভাবে আবার আর এক পাল্‌টা কলাগাছ দিয়ে বেশ করে লতা জড়িয়ে বাঁধা হল। তারপর জলে ভাসয়ে সাইকেল, ঝোলা তোলা হলো, আমরা উঠলাম। লতা বেঁধে একটা বোঠেও ওরা জুড়েছে। ঠেলে দিতেই ভেলাটা ছুটলো সোঁ-সোঁ করে যেন ষ্টীমার।

কি সে নদীর তোড়। এই নাকি কম স্রোত। মাঝ বরাবর এসেছে, একটা কলাগাছ তলার সারির ফাঁক হয়ে সরে যেতে লাগলো। বিষম বিপদ।

মোড়ল্ চট্‌পট্ ভেলা ঘুরিয়ে দিল। কলাগাছটা একেবারে খুলে বেরিয়ে গেল না। কিন্তু ভেলাটা একটু কাৎ হলো। মীড্ তাড়াতাড়ি সাইকেল ক'টা ভেলার লতার সঙ্গে বেঁধে নিলে। প্রায় মাইল দেড়েক ভাটিতে গিয়ে ভেলা ঠেক্‌লো ওপারে—যেমন ঠেকা অমনি উল্‌টে যায় আর কি তোড়ে; মোড়ল লাফিয়ে তীরে নেমে টেনে ধর্‌লো, ও লোকটাও নেমে হাঁটুখানেক জলে দাঁড়িয়ে ভেলার অন্ত মাথা ধর্‌লে।

তবু কলাগাছের ফাঁক দিয়ে ঝলক ঝলক জল এসে আমাদের গায়ে পিচ্‌কারী ছুটালো। আমরাও দেরি করলাম না, যে যার সাইকেল নিয়ে ঝোলা নিয়ে তীরে নেমে গেলাম। জুতো ঢুকে গেল পাঁকে। কোন মতে শক্ত মাটিতে যেয়ে দাঁড়ালাম। আমি মোড়লকে বখ্‌শিস দিতে গেলাম। বিপুল আমার হাত টেনে ধর্‌লো।

—ও কাজও কর্‌বেন না, ওরা অপমান মনে করে, ওরা মজুর নয়।

মোড়লের পিঠ চাপড়ে, তাকে সিগারেট দিয়ে বিদায় নিলাম—নমস্কার! 'নমস্কান্, নমস্কান্' ওরা দুজন এসে আমার সঙ্গে কোলাকুলি কর্‌লে। হাসিমুখে বিদায় হয়ে গেল।

আমরা পথ ধরলাম। একটু ঘুরে এসে একটা পথরেখা পেলাম। সাইকেল চালানো গেল কষ্টে। মাইল দুই পরে পুব থেকে এসেছে একটা চওড়া রাস্তা, সেটা পেয়ে উত্তর-পশ্চিমে চল্‌লাম লান্ সোয়ান পাহাড়ে। ওই পুব-মুখো রাস্তাটা আমাদের ফির্‌তি পথে নাকি কাজে লাগবে ক্রা যেতে।

—মিঃ বিশ্বাস এবার একটা কথা বলি, শিলাপং পৌছে পরশু রাতে মাংস খেলেন কিসের?

—কেন, সাপ নাকি?

—না, সাপের মাংস এত বড় টুকরো করে কাটা হয় না। খেয়েছেন গোসাপ, খুদে জাত।

কি আর বল্‌বো! এরাই দেখ্‌ছি আমায় মাংস ছাড়িয়ে সন্ন্যাসী কর্‌বে।

বিকেল বেলা পাহাড় সারি দেখা দিল। সন্ধ্যা নাগাদ্ পৌছে গেলাম পাহাড়-তলির পুলিশ ঘাঁটিতে। পাহাড়-চূড়ায় আর একটা পুলিশ ঘাঁটি। রাইফেলধারী পুলিশ। আর এ পাহাড়ে ঘেরাও-করা যে উপত্যকা, তাতেই রাজনৈতিক অপরাধীদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে থাই বাসিন্দাও আছে।

পরের দিন ওপরের ফাঁড়িটা দেখলাম। উপত্যকার পল্লীও দেখলাম। কমসে কম তিন শ' পরিবার সেখানে। তার ভিতর অপরাধী কত আর কে কে, কেউ বললে না। তবে একটি জাপানী দেখলাম, তার থাই-পত্নী আর দুটি ছেলে নিয়ে বেড়াচ্ছে। সে জাপানী যত ঝাল ঝাড়লে চীনাদের ওপর, বললে—'জাপান যেদিন সারা এশিয়া জয় করবে, সেদিন আমার মুক্তি। সে আশায় বুক বেঁধে বেঁচে আছি, নইলে হারিকিরি করতাম কবে।'

জার্ম্মান একটি, জার্ম্মান বলে চেনা যায় না, যেন মলয়ের শকাই জাতি ('মলয়েশিয়া ভ্রমণ' দেখুন)। সে বললে—ফ্যাটারল্যাণ্ড (ফাদারল্যাণ্ড অর্থাৎ জার্ম্মানী) যেদিন সারা বিশ্বের ডিকটেটর্ হবে, সেদিন আমি থাই গবর্ণমেণ্টকে দেখে'নব।

উন্মাদের প্রলাপ। না হবে কেন, ব্যক্তিত্ব-হারা মানবের বুদ্ধিবৃত্তির ভার-সাম্য থাকে না।

শুনলাম, জার্ম্মান আর একটি ছিল, সে এখান থেকে পালাতে চেষ্টা করে বাঘের মুখে প্রাণ দিয়েছে, সে-থেকে আর কেউ পালায় নাই। বিকালে দেখা গেল ওদের একটা কাবেরে। সব রকম খাবার পাওয়া যায়। দুধ-দইও আছে, দোকানের ম্যানেজার থাই, কিন্তু সহকারী একজন মলয়। মলয় কসাইও আছে।

সন্ধ্যার পর কাবেরেতে যুগলে যুগলে নৃত্য জন কয়েকের, বল্ ড্যান্সের অনুকরণ হলেও তাতে শ্বেত-লালসা নাই। জাপানী, ভারতীয় আর শ্বেতাঙ্গ ছাড়া সে নৃত্যে কেউ যোগ দেয় না। তখন দুটি ভারতীয়ের দেখা পেলাম। তারা চুপি চুপি জানালে তারাও বন্দী, বিয়ে করেছে অন্য বন্দীদের মত থাই নারী। কিন্তু একটা লড়াই লাগলে বা শ্যামের ভিতরে বিপ্লব হলে তারা পালাবে ব্রহ্মদেশে থাই-নারী থাই-সন্তানের মায়া কাটিয়ে। কোন্ পথে যেতে হবে তাও ঠাউরে রেখেছে। বোমাও জোগাড় হয়েছে।

দেখলাম, বন্দীদের ভিতর ভারতীয়েরই স্থির বুদ্ধি। একটি ভারতীয়ের পত্নী (থাই-যুবতী) বললে—ন্যাই, আমার স্বামী এখানে ইস্কুল খুলেছে, দেশেও মাষ্টারী করতো নিশ্চয়। আবার আমাদের খেলার মাঠ করে দিয়েছে, আমরা সবাই টান্সি (অর্থাৎ টেনিস) খেলি।

বেচারাদের জন্য দুঃখ হলো। জলের স্বাধীন মাছ ডাঙ্গায় এসে হয়েছে জড়-পদার্থ। পুলিশ-ঘাঁটিতে ফিরলাম, সেখানেই আমাদের আস্তানা। উপত্যকার একমাত্র প্রবেশ পথ, কেল্লার তোরণদ্বার যেন। দিনরাত ডবল পাহারা।

পুলিশেরা বল্লে, এখানে বড় একঘেয়ে জীবন। মাঝে মাঝে পুতুল নাচ ছাড়া আর আমোদ-প্রমোদ নাই। তবে তিন মাস অন্তর পুলিশ বদল হয়।

পরের দিন, পূবমুখো পথ ধরলাম। রাস্তা ভাল, কিন্তু গ্রাম বড্ড দূরে দূরে। তবে মঠ আছে। ভিক্ষুরও দেখা পাই। লান্ সোয়ান থেকে আস্‌ছি যে শোনে সে-ই নাক সিঁটকায়।

এখন আর আমরা গ্রামবাসীর বাড়িতে যাই না, আশ্রয় নেই মঠে। পথে কত গ্রাম এল—পাহাড়ের মাথায়, কোলে, পিঠে। দূর থেকে সে দৃশ্য চমৎকার। আরো ক'দিন এভাবের রাস্তায় চলে তবে পাওয়া গেল সমতল পথ। পাহাড়ের গোড়ায় ক'টা পল্লী, তারপর সমতল ক্ষেত্রের গ্রাম দেখা দিল। এখন দিনে আশি মাইল পথ চলাও সম্ভব হলো।

অবশেষে ক্রা গ্রাম। বেশ সমৃদ্ধ। বিশ্রামের সুবিধা হলো। বর্ম্মী (ব্রহ্ম-দেশবাসী) বহু বাস করে এখানে। তাদের পুরুষদেরও লম্বা চুল। নদী-জলে শাম্পান ভাসিয়ে বর্ম্মী-মাঝি চুল এলিয়ে দিয়ে গান গেয়ে গেয়ে যায়। তীরে ভেসে আসে তার মধুর রেশটুকু থেমে থেমে লহরে লহরে ঢেউয়ের তালে-তালে। সে এক অপূর্ব্ব একতান।

গান শুনে শুনে একঘেয়ে হয়ে গেল। দ্বিতীয় দিন লোকগুলার মুখের ভাব লক্ষ্য করতে লাগলাম। ওদের মুখের কথা শুনতাম। শ্যাম বা বর্ম্মী কেউ বেশি কথা কয় না। তবে কোন শ্যামের মুখে বর্ম্মী ভাষা শুনি নাই, অথচ বর্ম্মীরা শ্যামভাষা নিখুঁতরূপেই বলে। লোকগুলার মুখ যেন কি রকম শুক্‌নো, প্রফুল্লতা নাই।

মীড্ বল্লে—ক্রার নিকটেই ভিক্‌টোরিয়া পয়েণ্ট, সেখান থেকে মৌলমিন অবধি অঞ্চলটা শ্যামদেশ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে ব্রিটিশরা যুদ্ধ করে। কাজেই সেখানকার শ্যাম-বাসিন্দা সব সরে এসেছে। লোকসংখ্যা এখানে বেশি। শ্যামরা স্বাধীন, তারা বন্দুক-পিস্তল নিয়ে পথ চলে। বর্ম্মী পরাধীন, নিরস্ত্র, তাই অপমানে শির নত, বদন চিন্তান্বিত।

সঙ্গীরা নিয়ে দেখালো ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট। ম্যাজিষ্ট্রেট আসেন নাই, মামলা মোকদ্দমা নাই বললেই চলে। কারণ গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ যার মীমাংসা করতে পারে না সে মামলাই এখানে আসে। সপ্তাহে একদিন মামলার বিচার, বাকি ক'দিন অফিসের কাজ মাত্র। অনেকগুলা কেরানি।

কাষ্টমস অফিস, অন্যান্য যত অসামরিক বিভাগ সবই কোর্টের পাশে পাশে। মীড্ কাজ করেছিল কিছুদিন সিভিল বিভাগে। সে বললে—

কেরানিরা বেতন পায় মাত্র তিরিশ টিকেল। একজনের খোরাক-পোষাকে এর বেশি দরকার হয় না।

মনে পড়লো আমাদের দেশে একের রোজগারে দশে খায়, শ্যামে নর-নারী সবাই রোজগার করে, কেউ কারো ঘাড়ে বসে খায় না।

সবগুলা বাড়িতেই বড় বড় আলো। পুতুল-নাচের জন্যে নাকি? না পুতুল নাচ হয় বারোয়ারি স্থানে, ব্যক্তিবিশেষের বাড়িতে নয়। আর তা প্রতি রাতে হয় না, মাঝে মাঝে বন্ধ থাকে। সেটা হলো গ্রামবাসীর মিলনের অঙ্গ। বড় বড় আলোর তলায় বসে শ্যামবাসী পান-আহার গল্প-গুজব করে।

কেরোসিনের লম্প (ডিবে) কেউ কেউ জ্বালে, কেউ আবার গর্জ্জন গাছের ছাল মশালের মত জেলে কাজ সারে। লোকগুলার আশপাশেও চিন্তা-ভাবনা নাই। আনন্দ আর তৃপ্তি।

ওপারেই বর্ম্মী গ্রাম, সেখানে জমিদার শোষক, খাজনা-ট্যাক্স কত রকম। ফসলেরও অর্দ্ধ জমিদারের। চাষীর পেট ভরে না, সে আনন্দ করবে কোন্ প্রাণে!

ক্রা গ্রামের পাশের নদী পার হলেই ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট, ওটা ব্রহ্মের এলাকা। সেখানে ব্রিটিশের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, তাই উকিল, মোক্তার, মক্কেল গিস্ গিস্ করে আদালতে, হাকিম ফরসুৎ পায় না সপ্তাহের ছ'দিন পুরাপুরি মামলা বিচার করেও। আর এ-পারে ক্র'র হাকিম সপ্তাহে একদিন বিচারেরও মামলা পায় না। কোর্টে উকিল-মোক্তার হাজির থাকে না। কারণ শ্যামবাসী বিচারালয়ে মিথ্যা বলবে না। যদি কেউ বলে তবে আদালতের বাহিরে এলেই গ্রাম্য পঞ্চায়েতের বিচার, না হয় অদৃশ্য হস্তের গুলী তার মিথ্যা-ভাষণের শাস্তি দেয়। উকিল-মোক্তার শত চেষ্টায়ও তাদের দিয়ে মিথ্যা বলাতে পারে না।

ক্রা যোজককে কেটে খাল করবার পরিকল্পনা জাপানীরা এক সময়ে পেশ করেছিল। কিন্তু ইঙ্গো-আমেরিকা তার বিরোধিতা করে। বিশেষ করে

যে উঁচু পাহাড় বয়ে আমরা এলাম সেটাকে ওড়াতে খরচ অসাধারণ। সেজন্তই বুঝি কাজে পরিণত হয় নাই।

আমরা ভিক্টোরিয়া পয়েন্ট গেলাম না। ক্রা থেকে রওনা হলাম সোজা উত্তর দিকে, প্রথম দিন চলার পর রাস্তা মোড় ধরেছে উত্তর-পূবে। তিন দিনেই শ্যাম-সাগরের তীরে পৌছলাম। সেদিন সেখানে বিশ্রাম করে রওনা হলাম সাগর-তীর ধরে এঁকে-বেঁকে। সে যাত্রা হলো আমাদের বড়ই মনোরম। মোলায়েম আবহাওয়া, সাগরের কুহক বিচিত্র।

কয়েকটা গ্রামই পথে পড়্‌লো, সন্ধ্যার আমেজে যে গাঁ পেলাম সেখানেই নিলাম আশ্রয়। পরদিন প্রাতে ঘরের বার হয়ে তাক্ লেগে গেল। মাটির রং ধূসর, বালি নাই, একেবারে এঁটেল শক্ত। কূয়াটা অতিমাত্রায় গভীর, ষাট হাতের কম হবে না। অথচ এটা সমুদ্র-তীর।

যে ঘরে আশ্রয় পেলাম তার পাশেই তিন জন ইউরোপিয়ান বাস করে। এরা টিন-খনির মালিক, টাকার আণ্ডিল বেঁধেছে খনি থেকে। তার পরে শ্যাম-নারী বিয়ে করে এদেশের বাসিন্দা হয়ে পড়েছে। তাদের বাড়ির পাশে গীর্জ্জা, সেখানে পাদ্‌রি সাহেবের কোয়ার্টারও। এ চারজন ছাড়া শ্বেতাঙ্গ নাই। এরা এখন শ্যামের প্রজা।

পাদ্‌রি সাহেবের সঙ্গে ভরসা করে দেখা কর্‌লাম, মধুর আলাপী।

—কোন্ দেশের লোক তুমি?

—ইণ্ডিয়ান ভ্রমণকারী, মলয় থেকে আস্‌ছি, যাবো ব্যাঙ্কক হয়ে ইন্দোচীন।

—চমৎকার দেশ। পথে পড়বে ওঙ্কার বট্, হিন্দু সভ্যতার প্রতীক। হিন্দু প্রভাব দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সর্ব্বত্র, তবে শ্যামের মত সর্ব্ব-স্বাধীন আর কেউ নয়, শ্যাম-নারী আবার স্বাধীনতায় দুনিয়ার নারী-সমাজকে পেছনে ফেলেছে।

—সে নিদর্শন তো পথে পথে দেখে এসেছি।

—ইউরোপীয়ের জীবন-সঙ্গিনী তো দেখনি। দেখে যাও এখানে। চারটি থাই-নারী এখানে ইউরোপীয়ের পত্নী। কিন্তু এক দিনের তরেও তাঁদের গীর্জ্জায় প্রবেশ করাতে পারা যায় নি। তাঁরা আছেন পিতৃ-পিতামহের স্বাধীনতা আঁকড়ে, তার মানে কোন ধর্ম্মই না।

পাদরির পত্নী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন—গীর্জ্জার কয়েদী ঈশ্বরকে কেউ শ্রদ্ধা করতে পারে? আমাদের ভগবান স্বাধীনতা, দেহধারী নন, নিবাস সারা

দুনিয়ার সকল অণুতে অণুতে। বলুন দেখি আমরা কেন তাকে ছোট করে দেখে গীর্জ্জায় খুঁজতে যাবো ?

সে কথার ওপর কথা চলে না। পাদরিও চুপ, আমি তো এ সব পাঠে অরসিক। পাদরি-পত্নী জান্‌তে চাইলেন ভারতের কোন্ প্রদেশ আমার জন্মভূমি।

—বাংলা দেশ ম্যাদাম।

—এত নিকটের লোক আপনি ? এদেশ দেখে কি মনে হয় আপনার ?

—মনে হয় দুটি জিনিষ। একটি হলো—সারা দুনিয়া থেকে শ্যামদেশকে বাদ দিলে থাকে বুভুক্ষু অতৃপ্ত পৃথিবী। দ্বিতীয় হলো—আর্য্যনারীর যে স্বাধীনতাকে যে আদর্শকে ভারত পূজা করে, তার স্পর্শ দেখা যায় থাই-নারীর অগ্রসরতায়, দৃঢ়তায়।

—আপনার ভ্রমণ সার্থক। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারত-সভ্যতার আদর্শ এখানেই আছে, নইলে ভারতেও নেই, চীনেও নেই। অথচ ও-দুটি দেশ সেকালে ছিল সকল সভ্যতার উৎস। কিন্তু আজ তাদের দৈন্য।

বলেই নীরব হলেন পাদরি-পত্নী। শত চেষ্টায়ও ভারত সম্বন্ধে, শ্যামের ভারত-মৈত্রী সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেল না।

বিদায় কালে রাস্তায় এসে পাদরি বল্‌লেন—আমার স্ত্রীর মত যে, আদর্শ সভ্যতা ছেড়ে ভারত আর চীন বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে, সেজন্য ভারত বা চীন সম্বন্ধে কোন কথা আলোচনা করেন না। তিনি পুরাতনকে প্রাধান্য দিতে রাজি নন্। তবু তো আপনার মুখ-রোচক কথায় একটা কথা বলে ফেলেছেন। তিনি ভারত সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন ঢের। কিন্তু তাঁর ধারণা ও ইচ্ছা ভারত এখন শ্যামের সভ্যতা গ্রহণ করুক।

অন্য ইউরোপিয়ানদের বাড়িও গিয়েছিলাম। তাদের বাড়ি নয় তো রাজ-প্রাসাদ। পরিচারক-পরিচারিকা, ড্রইং রুম উচ্চাঙ্গের, লাইব্রেরী অমূল্য। তাছাড়া তাদের রান্নার ব্যবস্থায় সে যেন বিরাট ইউরোপীয় হোটেল। প্রভিশন (খাদ্য), মদ—এসবের ভাণ্ডার রাজসিক।

একটি ইউরোপীয়ের পত্নী থাই-নারী বল্‌লেন—ব্যাঙ্কক যাচ্ছেন তো ? শ্যাম দেশ দেখে স্বাধীনতা আপনাকে বিস্মিত করেছে নিশ্চয়, রাজধানীতে যেয়ে রাজার কার্য্যকলাপ যদি সূক্ষ্মভাবে দেখেন, তাহলে আপনাকে বল্‌তেই হবে রাজা

প্রজাধিপক শ্যামদেশের যোগ্য রাজা নয়। যে শ্যামদেশে বিচারালয়ে মিথ্যা বললে জনগণ তাকে গুলী করে মারে, সে শ্যামদেশে রাজা প্রজাধিপকের মত মিথ্যা-আচরণকারীকে কেউ শায়েস্তা করে না! আইন—জীব-হিংসা নিষেধ, কিন্তু রাজ্যময় কসাইখানা, নিলামে ডাক হয়ে তা বিলি হয়, মোটা আয় রাজ সরকারে, দপ্তরে লেখা থাকে "বিবিধ আয়"। এমনি করে দেখবেন রাজার প্রতিটি কার্য্যে মিথ্যার আশ্রয়। শ্যামবাসী তা আর সহ্য করবে না।

—পাহাড়ে, বনে, শহরে, গ্রামে সর্ব্বত্রই তো দেখে এসেছি বিপ্লবের সূচনা। মনে হয় এতগুলা স্বাধীন নর-নারীর প্রেরণা বিফল হবে না।

—ধন্যবাদ ইণ্ডিয়ান ভ্রমণকারী, আপনি যে শ্বেত পর্য্যটকের মত বাহিরের আবরণ দেখে ভুলে যান নি, শ্যামের অন্তরে প্রবেশ করেছেন, সেজন্য ভারতের শিক্ষাকে ধন্যবাদ।

বিদায় হয়ে এলাম।

রাতে বিপুল বল্‌লে—এখান থেকে কিছু দূর আর পায়ে না হেঁটে কি সাইকেলে না যেয়ে চলুন যাই নৌকায়। ভাল রাস্তা নাই।

—বেশ, সে ব্যবস্থা কর। আমি নৌকায় ভ্রমণে অভ্যস্ত।

সুরহীন নৃত্যলীলা

ভারতের আনন্দ-গান

(নৌকাপথ—ভাদেশ্বর——চীনাগ্রাম—সভা—নৃত্য——বানপং—অযোধ্যা—চারণসন্ন্যাসী)

—ভাদেশ্বর ! ভাদেশ্বর ! ভাদেশ্বর !
সমবেত কণ্ঠের উচ্চ চীৎকার, উল্লাসের কল-কল্লোল।
বিরাট এক কাষ্ঠ-স্তূপের ধারে এক ব্যক্তি উবু হয়ে আছে
পাশে দাঁড়ান আট-দশ জন লোক।
মুহূর্ত্তে কাষ্ঠ-স্তূপ ফর্‌ফর্ করে জ্বলে উঠলো।
আবার জিগীর—ভাদেশ্বর ! ভাদেশ্বর !
সঙ্গীদের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালাম।
বিপুল ও মীড্ বলে উঠ্‌লো—এটা শ্মশান। মড়া পোড়ান হচ্ছে।

'ভাদেশ্বর' ধ্বনি কার উদ্দেশে সঙ্গীরা বল্‌তে পার্‌লো না, তবে এটা চিরকালের প্রথা। ভদ্রেশ্বর তো মহাদেব। ভূতের ভয়ে এ নামে শরণ নেওয়া নাকি! আবার মনে পড়লো বৌদ্ধ ভিক্ষু-শ্রমণ-অনাগারিকদের সম্মান-সূচক আখ্যা 'ভদন্ত'। ভদন্ত-শ্রেষ্ঠ অর্থেও ব্যবহার হতে পারে।

শব যেখানে অগ্নিসাৎ আর হবে শূন্যে বিলীন, সেখানে বৌদ্ধবাদীরা তাদের ভিক্ষু-প্রধানের নামও কীর্ত্তন কর্‌তে পারে ভগবান তথাগতে বিলয়-প্রাপ্তির আশে। কথাটা যে সংস্কৃতের অপভ্রংশ তাতে সন্দেহ নাই। বান্ সেধোর ইন্‌স্‌পেক্‌টার এর হদিস্ দিতে পার্‌তো। বিপুল আর মীড্ নামেই গবেষক, একটা কথাও তো জান্‌তে চায় না ভারত সম্বন্ধে। অথচ বলে ছিল ওটাই হবে ওদের পারিশ্রমিক।

... ...

সবজান্তা পাদরি-পত্নীর মুখে শ্যাম-সভ্যতার সৃষ্টিছাড়া প্রশস্তি শুনে অন্তরে বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠেছিল। অতিকষ্টে তা চেপে গিয়েছিলাম। ঊষার আমেজে যখন নৌকাখানি পাল তুলে আমাদের নিয়ে ভাস্‌লো শ্যাম সাগরের বুকে, তখন স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লাম।

তীর ঘেঁসেই চলেছে নৌকা। মাঝিরা কিন্তু গান গায় নাই। বোধ হয় দাঁড় টানার কঠোর শ্রম লাঘব করবার জন্যই ওরা গেয়ে থাকে গান। তাই নৌকা পালে চল্‌ছে বলে ওদের কণ্ঠ নীরব।

মাঝে মাঝে খালের মত নদী এসে সাগরে আত্মদান করেছে—সেগুলার কোনটা আবার বিল-ঝিলে অঙ্গ মিলিয়ে দ্রুত চলে এসেছে। বুঝলাম সাগরতীর দুর্গম এজন্যই নৌকাযাত্রা। সাগরের দিকে পিছন ফিরে বস্‌লে হঠাৎ মনে হয় আমার বাড়ির পাশের বিলটা দেখা যাচ্ছে—দুটো একটা পাহাড়ের মাথা উঁচিয়ে আছে দূরে। সাগরের নীল কলেবরে চোখ পড়্‌তেই সে স্বপ্ন উপে যাচ্ছে।

ক্রমে গ্রাম দেখা দিল একে একে কয়েকটা। সঙ্গীরা নৌকা থামালো না। রান্না খাওয়া নৌকায়ই সারা হলো। স্নান করা গেল না। স্বাস্থ্যভঙ্গের ভয়ে। বিশ্রাম করে আবার আমরা উঠে বস্‌লাম। তীরের দৃশ্য মনকে টান্‌ছে অবিরাম।

বিকাল বেলা। নৌকা চলেছে পূর্ণ বেগে সাগরের সঙ্গে ছল্‌-ছলাং শব্দে আলিঙ্গন কর্‌তে কর্‌তে। দূরে মনে হলো একটা বড় গোছের গ্রাম। ঘরের চালগুলা দেখা যাচ্ছে গাছের সারির ফাঁকে ফাঁকে। হঠাৎ চীৎকারে বাতাস কম্পিত হলো—

ভাদেশ্বর! ভাদেশ্বর! ভাদেশ্বর!...

একটা ঢিবিপানা উঁচু স্থানে সমবেত কতকগুলা লোকের কণ্ঠস্বর সে।

পাল নামাতে নামাতে নৌকা ঢুক্‌লো একটা খালে, তারপর ঢিবিটার পাশে ভিড়লো। আমরা উঠে গেলাম। উবু হওয়া লোকটা সেখানে নাই। সে কোথা গেল?

—মুখাগ্নি সেরে ঐ যে কাঁদতে বসেছে!

চেয়ে দেখি লোকটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, আর একটি মহিলা তার চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু মহিলা অশ্রুসিক্ত নয়।

চিতার দিকে নজর দিতেই অবাক্ হয়ে গেলাম কফিন্ দেখে। কফিনের নীচে ওপরে মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি। এখনো কফিন্ ধরে নাই। চিতা থেকে একটু দূরে বসে শ্মশান-বন্ধুরা চা-কাফি কেক্‌-বিস্কুটের সদ্ব্যবহার কর্‌ছে হাসিমুখে। শ্মশানের গাম্ভীর্য্যকে তরল করে দিয়ে তারা হাসির হর্‌রায় গতবারের শবদাহে খাদ্যের স্বল্পতার খোয়ার কাটছে।

এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে কামনান বলে পরিচয় দিলেন, তাঁদের গ্রামে যেতে অনুরোধ জানালেন। বিপুল ও মীডের সঙ্গে সে গ্রামে গেলাম। মাঝিরা নৌকায় রইল। আমাদের আস্তানা হলো ডাক বাংলো-গোছের প্রকাণ্ড ঘরে। শুনলাম সেটা গ্রামের সভাঘর। মীড রান্নার ব্যবস্থায় গেল। আমি ও বিপুল শ্মশানের দৃশ্য নিয়েই আলোচনা সুরু করলাম।

—শ্মশানটা শুধু এ গাঁয়ের একচেটে নয়। পাশাপাশি তিন-চার গ্রামের ওই একটি শ্মশান-কেন্দ্র। আর কফিনটা দেখ্‌লেন তো, সকলের শব কিন্তু কফিনে আবদ্ধ করে আনা হয় না। জাঁক-জমকের শবদাহেই কফিন্ ব্যবস্থা। সাধারণতঃ খাটিয়ায় করেই আনা হয়। কেউ কেউ আবার চাটাই বা দরমায় মুড়ে আনে, যেখানে শবযাত্রীর সংখ্যা কম।

—শবদাহে তা হলে কোন ভেদ নেই, কেমন?

—কিছুটা আছে। কফিনের শব সংকার করা হয় ঘটা করে প্রচুর মোটা মোটা কাঠ দিয়ে, নীচে চুল্লী কাটতে হয় না। অন্য শবের বেলা চেলা-কাঠ, তাও খুব বেশি নয়, তাই চুল্লী কেটে তার ওপর মোটা দুটো কাঠ দিয়ে শব স্থাপন করা হয়। চারদিকে বাঁশের খুঁটি পোঁতা হয় জলন্ত কাঠ না সরে আসে।

—ঠিক আমাদের দেশের প্রথা। তবে আমাদের শ্মশানে 'ভাদেশ্বর' নয় চীৎকার হয় 'হরি'।

—ভাদেশ্বর ধ্বনি করা হয় প্রথম মুখাগ্নির সময়। পরেও হয়, কারণ লোকগুলো করে কি জানেন? চিতা জলে উঠ্‌লে পরেই নানা রকম খানাপিনায় মেতে ওঠে, মদ চলে প্রচুর, তাই হৈ-হল্লায় আসর জমাতে তারা 'ভাদেশ্বর' চীৎকার সুরু করে। এদেশে শবদাহ নিরানন্দ অনুষ্ঠান নয়।

—শবদাহ হলে পরে আর কোন ক্রিয়া-কর্ম্ম নেই?

—শুধু চিতাভস্ম নদী বা সাগরের জলে ফেলা, শ্মশান পরিষ্কার করা। তারপর স্নান করলেই সব চুকে গেল। অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া বলে কিছু নেই। শুধু খাওয়া-দাওয়া, শ্মশানে উপস্থিত সকলকেই মুখরোচক নানা খাদ্যে ভূরি ভোজন করানো হয় শ্মশানে বসিয়ে। কোন গরীব-দুঃখী যদি এসে হাত পাতে তাকেও সমাদরে খাওয়ানো হবে।

—কই আমাদের তো কেউ খাবার দিল না!

—মাছ-মাংস এ ভোজে থাকে না, তাই সঙ্কোচ করে দেয় নি।

—আচ্ছা, লোকটা যে কাঁদলো তার কে মরেছে ? মহিলাটিই বা কে ?

—মরেছে লোকটার ছেলে, মহিলা তার স্ত্রী। এদেশে নারীকে প্রকাশ্যে কখনো কাঁদতে দেখবেন না। সে যে কখন্ সঙ্গোপনে শোক-তাপ করে কেউ দেখ্তে পায় না। নারীই পরিবারের সকলকে সান্ত্বনা দেয়।

—নারীই শ্যামদেশে পরিবারের 'অভিভাবক'। যে দেশে নারী গৃহের বাহিরের শ্রমের সকল কাজ করে, সে দেশে পুরুষগুলাই জেনানায় আবদ্ধ থেকে সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ করে, আর নারী হয় সংযমী, স্বাবলম্বী, মনটাও হয় যেন কঠোর। খাসিয়াদের ভিতর ঠিক এমনিধারা ভাব দেখেছি। খাসিয়া-নারীই যেন বেশি নির্ম্মম।

এমন সময় এলেন কামনান্। নানা রকম মিষ্টান্ন ও অন্যান্য খাদ্য এল আমাদের জন্য। তার পশ্চাতে এল চার-পাঁচটি তরুণী, বাদ্যযন্ত্র হাতে তরুণ বাদক। তখন সন্ধ্যা হয়েছে। বড় সড় একটা আলো জ্বালা হলো। বাদকেরা মেঝেয় বসে বাজাতে লাগলো, তরুণীরা কর্‌লো নৃত্য। কিন্তু তারা গান গাইলে না, বা সুর দেবার কোন যন্ত্র ছিল না সঙ্গে।

আধ ঘণ্টা পরে তারা বিদায় হলো। কামনানও শ্রান্ত বলে বিদায় নিলেন, পরদিন এসে আলাপ কর্‌বেন বলে চলে গেলেন। রাতে আমাদের খাওয়াও হলো ভূরি ভোজন।

শুয়ে শুয়ে বিপুলকে জিজ্ঞাসা করলাম—নৃত্য বুঝি শ্রাদ্ধের অঙ্গ, কি বল ?

—না, মিষ্টার বিশ্বাস! আপনার অভ্যর্থনা ওটা। এ মুলুকে নৃত্য খুবই প্রচলিত।

—অঙ্গভঙ্গি তো আমাদের দেশের আধুনিক নৃত্যের কাছাকাছি। যব-বলির স্পর্শ আছে।

পরদিন প্রাতে আমাদের ফেন-ভাত, চা প্রভৃতি পানের পরক্ষণেই এলেন পান চিবোতে চিবোতে কামনান আর পূজাইবানেরা। একটু পরে এলেন পঞ্চায়েতের দপ্তর-কর্ত্তা অর্থাৎ কেরানি। মনে হলো গত রাতে এঁরা সকলেই মদ্য পান করেছেন অতিরিক্ত। এখন মাতলামি কর্‌ছেন না বটে; তবে দিল খুলে সকল কথা বলে যাচ্ছেন একটু বাড়াবাড়ি করে।

বিপুলকে উদ্দেশ করে প্রথমতঃ বিপ্লবের দিন কেন স্থির করা হচ্ছে না, এ অভিযোগই তাঁরা কর্‌লেন। কামনান বল্‌লেন,—

—দিন একটা স্থির করে দেশময় সংবাদ রটানো যেমন দরকার, তেমনি জরুরি হয়ে পড়েছে একজন কম্যাণ্ডার বহাল। তাহলেই আমরা রাইফেল ঘাড়ে করে এগোতে পারি। শ্যাম সরকারের ঝানু সেনানায়করা যদি আমাদের দলে না আসে, না আসুক। তারা সৈনিক পাবে না একজনও তাদের তরফে—রাজার তরফে।

বিপুল গম্ভীর হয়ে বলে গেল—অনেক দিন তো অপেক্ষা করেছেন, আর অল্পদিন ধৈর্য্য ধরে থাকুন। সবই ব্যবস্থা হবে। সেনানায়ক পাবেন গ্রামে বসেই, একেবারে ইউরোপের যুদ্ধ-ফেরত সব। উতলা হবেন না। সকল সুযোগ-সুবিধে করে আপনাদের খবর দেব।

সমবেত জনতা হর্ষ-ধ্বনি করলো, তার মানে 'খুন-থাইয়ের জয়!'

গ্রামটা ঘুরে দেখলাম। পথে যার সঙ্গে দেখা হয়, সে-ই বিপুলকে বলে—শিগগীর খবর পাঠাবেন, প্রজাধিপককে আর বৃথা একটি দিনও রাজাসনে দেখতে চাই নে।

তাহলে [illegible] [illegible] ভিক্ষুরা বলেছে, হাইলাই মঠের ভিক্ষুরা বলেছে—'ক্ষেপাদের কেল্লায় ঢুকে পড়েছ, হুঁশিয়ার', সে কথা তো মিথ্যা নয়। বিপ্লব বিপ্লব বলে এরা সত্যই ক্ষেপে উঠেছে। আর বিপুলের সঙ্গে এরা যে ভাবে কথা বলছে, তাতে মনে হয় বিপুল এ-তল্লাটের সকলেরই পরিচিত। শুধু পরিচয় নয়, বিপ্লব পরিচালনেও তার নিশ্চয় একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ আছে। তা হোক, ব্যাঙ্কক পৌঁছে গেলে আর তো ওদের ধার ধারবো না।

সেদিন রাতেই আমরা আবার নৌকা ভাসালাম।

ছয়-সাত মাইল ঘুরে একখানি ছোট্টগ্রামের ঘাটে যখন নৌকা লাগলো রাত তখন দুটো, উল্টা বাতাসের জন্য দু ঘণ্টার পথ আমরা পাঁচ ঘণ্টায় এসেছি। নৌকায়ই রাত কাটালাম আমরা। ভোরবেলা গিয়ে গ্রামে ঢুকে পড়লাম। গ্রামবাসী অধিকাংশই চীনা আর অর্দ্ধ-চীনা। চীনা হলেও একটু লম্বা গড়নের, কারণ এরা এসেছে উত্তর চীন হতে।

জোয়ারের সময় গ্রামের খালগুলা, কোন কোন নীচু মাঠও একেবারে তলিয়ে যায় প্লাবনে, তারপর ভাটার টানে যখন ডোবা-খাল, জুলি-নালা, মাঠ থেকে জল নেমে যায়, তখন সেখানকার পচা পাঁকে এমন দুর্গন্ধ ছুটে ওঠে যে, নাকে কাপড় না দিয়ে চলা দায় পথে।

আমরা যখন গ্রামে প্রবেশ করেছি তখন জোয়ার। জুলি-নালায় জল থই থই কর্‌ছে, আর তারই মাঝে খেলে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট মাছ, কখনও লাফাচ্ছে, কখনও ডুব্‌ছে, কখনও ভাস্‌ছে। চীনা এক ভদ্রলোকের বাড়িতে আশ্রয় নিলাম।

বিপুল বল্‌লে—এ গ্রামে চীনার সংখ্যা বেশি হলেও শ্যামভাষা শিক্ষা দেবার বিদ্যালয় আছে। তবে সে বিদ্যালয় বসে রাতে। কারণ শিক্ষক চীনাই, তারা দিনের বেলা চালায় চীনা-স্কুল আর রাতে চালায় শ্যাম-স্কুল। রাতে সে স্কুলে যাওয়া যাবে কি বলেন?

—হাঁ, শ্যামভাষার স্কুলটাই দেখা দরকার, নইলে দিনের বেলা গিয়ে চীনা ছাত্র-ছাত্রী দেখে কি হবে?

সারাদিন বাড়ির মালিক চীনার সঙ্গে আলাপে কাটিয়ে সন্ধ্যার পর আমরা খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকালাম। তারপর টর্চ নিয়ে বেরোলাম পথে। বাড়িতে-বাড়িতে আলো, সে আলোতে যেখানেই জল সেখানেই অপূর্ব আলোক-করা শোভা। সকালে ছিল জোয়ার, দুপুরের পর থেকে সন্ধ্যা অবধি গেছে ভাটা, আবার জোয়ার এসেছে।

টর্চের আলো জুলি-নালায় পড়লেই বাতাসী তানুকোনা মাছগুলা দাপাদাপি করে। বিদ্যালয়টার আলো দোর-জানালা দিয়ে বেরিয়ে এসে মাঠের জলে পড়েছে, হাওয়ার তালে তালে জল নাচ্‌ছে সে আলোর সমারোহ বুকে করে। আলোক-রশ্মি জলে পরছায়া ফেল্‌ছে অগুন্‌তি—কোনটা উজ্জল, কোনটা ঝাপ্‌সা। সে যেন দীপালি উৎসব।

বিদ্যালয়ে প্রবেশ করলো আমাদের আগে আগে কয়েকজন ছাত্র। আমরা প্রবেশ করে দেখি—পঁচিশ ছাব্বিশটি ছাত্র। ছাত্র বলে তাঁরা সব নাবালক নন। সবাই বয়ঃস্থ। চীনা, মলয়, ইণ্ডিয়ান, সিংহলী সকল জাতিই রয়েছেন। এমন ছাত্র-সমাবেশে নৈশ বিদ্যালয় জীবনে আর দেখি নাই। দেখ্‌বো কোথা? সবে মলযদেশ আর শ্যামরাজ্যের যে অংশ দেখেছি—এই তো আমার তখনকার ভ্রমণ।

আমরা তিন জন যেয়েও ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি করলাম।

শিক্ষক একটি প্রবীণ, বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় বল্‌তে লাগ্‌লেন—'এশিয়ার পরাধীনতার মূলে শিক্ষার অভাব। জগৎ আজ কি ভাবে কোন্ পথে এগিয়ে যাচ্ছে সে সংবাদ ক'জন এশিয়াবাসী রাখে। এদিকে আমরা সবে দৃষ্টি দিতে আরম্ভ করেছি। শ্যামের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত আর চীনে চলেছে বিদ্রোহ-বিপ্লব।

তাদের সঙ্গে যোগসূত্র রেখে আমরা এগিয়ে চল্‌তে চাই। কিন্তু ব্রিটিশের হাতধরা শ্যামরাজ প্রজাবর্গিক সন্দেহ দৃষ্টিতে আমাদের দেখেন। আমাদের আর এ রাজ্যে কাজ কর্‌তে দেওয়া বোধ হয় ব্রিটিশের পরামর্শে রাজার মনঃপূত নয়। সরকারী কর্ম্মচারীর ভিতর [illegible] রাজার মতে মত দিচ্ছে। তারা বিদ্রোহ-বিপ্লব পছন্দ করে না। [illegible] বিবাদী [illegible] কিন্তু তারা ভুলে যায় [illegible] নরনারী [illegible] দুটি যারা প্রথম এদিকে [illegible] নয়। অবশ্য তাদের জনগণ কোনদিনই অন্যদেশের মত সর্ব্বহারা নয়, গণমতের প্রভাব এদেশে অতীত কাল হতেই [illegible]। তবু যে তৃতীয় পক্ষ একটা দরদ দেখাচ্ছে, তাদের যদি কোন কুমতলব না থাকে, তবে আমরা তাদের সহকর্মী হবো। সে তৃতীয় পক্ষের গোপন কার্য্যক্ষেত্র মলয়ে, প্রধান আড্ডা সিঙ্গাপুরে। সুয়াং সংক্রাম (শ্যামরাজের মলয়-প্রতিনিধি) সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশের সঙ্গে কি ব্যবস্থা করছেন, তার ওপরই আমাদের কার্য্যক্রম নির্ভর করে। তাই বিপুল সে সংবাদ নিয়েই সুদূর সিঙ্গাপুর থেকে আসছেন। তাঁর মুখেই আপনারা সে সংবাদ শুনবেন ও পথ বেছে নেবেন।

বিপুল বক্তৃতা দিলেন—তিন মাস পূর্ব্বে আপনারা যা আশঙ্কা করছিলেন ব্যাপার তাই দাঁড়াবে। তাই আপনারা বিচলিত হবেন না। একটি একটি করে আড্ডা তুলে দিয়ে আপনারা একটা-না-একটা কাজ জুটিয়ে শ্যামবাসীর ভিতর বেমালুম মিশে যান। এক জায়গায় বেশি সংখ্যায় থাক্‌বেন না। আপনাদের নিজ দেশের সঙ্গে গোপনে সংবাদ আদান-প্রদান করুন। আপন দেশের মূল সমিতি হতে যে নির্দ্দেশ পাবেন সে ভাবে চলবেন, কারণ তখন তারাই আপনাদের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। আমাদের ওপর সে দায়িত্ব চাপানো ঠিক হবে না, কারণ আমাদের হাতে বহু রকমের বহু কাজ। তবু আমরা যথাসাধ্য আপনাদের সহায়তা করবো।

বক্তৃতা শুনে সভ্যগণ দুঃখিত হলেন, তাঁরা ম্লান মুখে চলে গেলেন। আমরা বাস্তানায় ফিরে এলাম। কিন্তু সারা রাত ঘুম হলো না। অবাক্ কাণ্ড! বিপুলও শেষটায় হয়ে দাঁড়ালো [illegible]ান রিপাবলিকান এসোসিয়েশনের চাঁই। তবু জান্‌তে ইচ্ছা হয় কি মতলবে ওরা দুজন আমার পথ-প্রদর্শক হয়েছে। ওদের সংবাদ প্রচার কর্‌তে আমার সঙ্গে না এলেও চল্‌তো, এদেশে বেশি গোপনতার প্রয়োজন হয় না। ওদের ভিতর স্পাই নাই। তবে ওরা নিশ্চয় আমায় পাহারা

দিচ্ছে। এত কষ্টকর পথে এনেছে আমার সত্যকার উদ্দেশ্য পরখ করতে। ভ্রমণ লক্ষ্য না হলে ধৈর্য্য হারাতাম।

আমি স্থির করলাম প্রকাশ্যে সে সম্বন্ধে কিছু বলবো না ওদের। ব্যবহারেও কোন পরিবর্তন করলাম না। আমি কেবল [illegible] কথাই ওদের কানে [illegible] নেই। যেন কিছুই ঘটে নাই।

সভায় নানান দেশের বিদ্রোহী [illegible] যে নীতি [illegible] করা বিপুল বললে, তাতে মনে হয় হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েশনের সিঙ্গাপুর-চক্র নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত করেছে যে, এ সকল বিদ্রোহীকে পরখ না করে দলভুক্ত করা হবে না। কারণ এ জাতীয় উগ্রপন্থীরা অনেক সময় নির্য্যাতনের ভয়ে প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছে অতীতে। কাজেই 'survival of the fittest' (যোগ্যতমের মৃত্যুঞ্জয়) নীতি। আর যদি তাদের নিজ নিজ দেশের জাতীয়তাবাদী দল থেকে কোন সুপারিশ আনতে পারে তখন তাদেরে কর্মী হিসাবে গণ্য করা হবে। সিঙ্গাপুর-চক্র নিশ্চয় শ্যামে গোয়েন্দা-গুপ্তচরের বর্দ্ধিত ক্রিয়াকলাপের আশঙ্কা করে।

আমার ভয় হলো, রিপাবলিকানরা আবার আমার জন্য কোন্ প্যাঁচ খাড়া করে তার ঠিক নাই। সঙ্গী দুটিকে জানতে না দিয়ে হুঁশিয়ার থাকতে হবে। মনে মনে সেটা স্থির করলাম বটে, কিন্তু কার্য্যকালে সে হুঁশ থাকবে কি? কাউকে সন্দেহ করা, বিপদের আশঙ্কা করা—এমন সূক্ষ্মবুদ্ধি আমার নাই।

এজন্যই বুঝি আমাদের কবি গেয়েছেন—

'সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে,
তার কোন পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাইনে সর্ব্বত্র তাঁর প্রবেশের দ্বার;
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।

দেশে থাকতে শুনেছি ভূত তাড়াতে রামনাম উচ্চারণ করতে হয়। মলয়ে দেখেছি তামিল শ্রমিক পদাঘাত খেয়ে 'রামাইয়া!' 'রামাইয়া!' বলে দুঃখ হজম করে। আবার হিন্দুস্থানীরা 'রাম রাম বাবুজী' সম্বোধনে অভিবাদন জানায়। 'রামা' যেন সকলের আজ্ঞাধীন। 'রামা' একজন তো আমিও নিজে। আমি আর কোন্ রামাকে ডাকবো, তাই এ পাপীর মুখে ও-নাম কোন দিন জুয়ায়

নাই। যে ভগবান চোখে দেখে না, ডেকে ডেকে যারে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় পদে পদে যে 'আমায় রক্ষা কর,' তেমন অন্ধ ভগবানের ওপর কোনদিন শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারি নাই। তাই আজও সে চেষ্টা করলাম না। সব ছেড়ে দিলাম—উপস্থিত-বুদ্ধির ওপর—অন্ধকার ভবিষ্যতের ওপর।

ভোর হবার আগেই উঠে পড়লাম। সারা রাত ঘুম হয় নাই। স্নান করে নিলাম। ইচ্ছা ছিল একাই ছোট্ট গ্রামটা ঘুরে দেখি, কিন্তু একা গেলাম না, পাছে সঙ্গীরা বোঝে তাদের এড়াতে চাই। তাই বিপুলকে নিয়েই বেরোলাম।

এ গ্রামটায়ও কয়েকজন ইউরোপিয়ান আছে দেখে আশ্চর্য্য মনে হলো। তারা শ্বেত-আভিজাত্য ভুলে শ্যামদের সঙ্গে বেমালুম মিশে গেছে। বিয়ে করেছে কেউ অর্দ্ধ-চীনা, কেউ থাই-নারী। পাড়া-পড়শীরা তাদেরে পৃথক করে রাখে নাই, তারাও শ্যামবাসীদের প্রতি সম-ব্যবহারই করে। এ রূপটি সমগ্র প্রাচ্য দেশে কেবল শ্যামেই দেখেছি। নইলে আর সব দেশেই তো শ্বেতের প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন, শ্বেতের মন জুগিয়ে চলা, ভারতও সে দুর্ব্বলতা থেকে মুক্ত নয়।

কামনান, পুজাইবান, কেম্রাত্রি—সকলের বাড়িতে গিয়েই দেখা করে এলাম। তারা আমাদের সাবন্থ মন্ত দিয়ে অভ্যর্থনা করলো। রাস্তায় বেরিয়ে দেখি ভাটা লেগেছে, জল নেমে গেছে মাঠ-ঘাট থেকে, আর দুর্গন্ধ বিষম হয়ে উঠেছে। মোটেই ভাল লাগলো না। রাতের খাওয়ার পর আমরা নৌকায় গিয়ে ঘুম দিলাম। মাঝিদের বলে দেওয়া হলো, খুব ভোরে নৌকা খুলতে।

সকাল বেলা নৌকায় ভ্রমণ অতি মনোরম। ক্রমে রোদ বাড়লো, আর ছইয়ের বাইরে থাকা গেল না। তীরের সৌন্দর্য্যও তেমন ভাবে উপভোগ করা হলো না। দুপুর নাগাদ সমুখে ধূ-ধূ করছে একটা গ্রাম। কাছাকাছি পৌঁছতেই লক্ষ্য করলাম গ্রামটা ছোট্ট। কিন্তু চারদিকে তার কাঁঠাল, সুপারি, নারিকেল গাছের বাগান।

নৌকা ভিড়িয়ে আমরা গ্রামে প্রবেশ করলাম। একটা স্কুল-ঘরের মত, তা থেকে ভেসে আসছে তালে তালে বাদ্য-আর ঝুম্ ঝুম্ টুং টাং নর্ত্তনের রেশ। রবাহূতই আমরা ঢুকে পড়লাম সে ঘরে। কয়েকজন প্রৌঢ় দশ-বারোটি তরুণীকে নৃত্য শিক্ষা দিচ্ছে।

শিক্ষকের পরিচালনায় সঙ্গে সঙ্গে তরুণীরা হচ্ছে নৃত্যপর, হস্তের মুদ্রা-ভঙ্গিমা, পদ-সঞ্চালন, মুখের অভিব্যক্তি কতকটা আমাদের আধুনিক নৃত্যের মত। অঙ্গ-

ভঙ্গিতে যব-বলি-ভারত প্রভৃতি দেশের নৃত্যের ছাপ থাকলেও একে 'লাস্য' বলা চলে না, বরং কসরৎ বা সামরিক নৃত্য আখ্যা দিলেই যেন ঠিক হয়। সর্ব্ব-স্বাধীন থাইনারীর বাধাহীন স্বাধীনতার কঠোর পরিবেশ যেন সমুদয় নৃত্যকে করেছে মঞ্জুল-ছন্দোবিহীন।

তবে তার একটা প্রধান কারণ হয়তো সুরহীন সঙ্গৎ। শুধু তাল দিবার ঘিনিতাক্ পিং পং বাদ্যই বাজানো হচ্ছে, কোন সুরযন্ত্র বাজাবার রেওয়াজ নাই। নৃত্যের সঙ্গে গানও গায় না ওরা। সুতরাং ভারতবাসীর কানে সে নৃত্য প্রসাদ-গুণ-রহিত।

আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, কিন্তু নবাগত তিনটিকে দেখে কেউ এগিয়ে এল না স্বাগত জানাতে, নর্ত্তনরত তরুণীরাও করে নাই সঙ্কোচ। শেষটায় হতাশ হয়েই বেরিয়ে এলাম, পাশের এক বাড়িতে যেয়ে অনাহূতেই স্থান জুড়ে বসলাম। কেউ একটা টুঁ শব্দও করলো না।

বাড়িটার সমুখে একটা জলায় এসে জোয়ারের জল ঢুকেছে। আপাতদৃষ্টিতে সেটা জলা মনে হলেও, গভীর আদপেই নয়। কারণ ঘাসের ডগাগুলা তখনও এখানে ওখানে জলার বুকে মাথা জাগিয়ে আছে। সে ঘাস-পাতার চারদিকে মাছ ফর্ ফর্ করছে। লোভ বড় বালাই। মীতুকে ডেকে নিয়ে আমার খদ্দর চাদরটার সাহায্যে অনেকগুলা মাছ ছেঁকে তুললাম। কিন্তু রান্না করবার সময় মীতু্ বললে—

এমন জ্যান্ত মাছ আমরা কুটবোও না, রাঁধবোও না।

অগত্যা সে কাজ আমায়ই করতে হলো। তবে সে কাজ সহজ হয় নাই। ছুরির সাহায্যে ছোট ছোট মাছ কাটা, আঁশ ছাড়ানো, সে যে কী বিদ্ঘুটে পণ্ডশ্রম, তা পাঠক-পাঠিকারা একবার চেষ্টা করে দেখলেই মালুম করে নিতে পারবেন। অথচ খাবার বেলা কিন্তু মীতু্ বা বিপুল কোন আপত্তি জানায় নাই জ্যান্ত মাছের ঝোল বলে, বরং তরতাজা মাছের স্বাদ পেয়ে ভাগ যা বসিয়েছে তা আমার দ্বিগুণ।

বিকাল বেলা গ্রামটা ঘুরে দেখলাম। মাত্র পনরটি পরিবার এ গ্রামে বাস করে, প্রত্যেকের ঘরেই বন্দুক-পিস্তল-তলোয়ার ঝুলানো, বঙ্গের পল্লীতে যেমন ঠাকুরঘরে থাকে একখানা দুখানা খাঁড়া শক্তিপূজায় বলি দেবার জন্য, কিম্বা ভাড়াটে লেঠেল সর্দ্দারদের ঘরে যেমন থাকে রাম-দা, সড়কি প্রভৃতি।

অনেকে আবার খেলনা পিস্তল কিনে ঘরের প্রকাশ্য স্থানে রেখেছে। তবু শ্যামদেশের যতটা দেখেছি তাতে বুঝেছি, পিস্তল-রাইফেলের এত ছড়াছড়ি হলেও

অস্ত্র ব্যবহারে থাইরা সংযত। একে অন্যে ঝগড়া-ঝাঁটি হলে কিল চড়ই চলে, সহসা শিকল [illegible] তার কথা হয় না। যাদের ঘরে ঘরে অস্ত্র-শস্ত্র, তারা তার ব্যবহার [illegible] জানে।

[illegible] হলো আবার [illegible] বেশে, ভূষণে [illegible] ছিল দেখা, [illegible] ধরে নাই। তবু এক মেয়ে মনে [illegible] বাজার মোহ এদের কাঁচা বয়স, অঙ্গের লাবণ্যের জন্যই এদের লালিত্য মধুর—নায়ক সাজেও।

নৃত্য সাঙ্গ হলো। তরুণীরা বেশ পরিবর্তন করে স্বাভাবিক পরিবেশে এসে যোগ দিল আমাদের সঙ্গে কাফি পান করতে। তখন তারা অন্য দশজনের মতই নির্বিকার ভাবে ঘরোয়া কথায় চটুল হয়ে উঠলো। কে বলবে একটু আগে এরাই নট-নটী রূপে অবতীর্ণ হয়ে করেছিল লীলা চপল নর্ত্তন-মাধুরী পরিবেশন। গ্রামবাসীর এ নির্লিপ্ততা লক্ষ্য করে অবাক হলাম। কেউ একটি কথাও বললো না সন্ত-আচরিত নৃত্যাভিনয় সম্বন্ধে।

তারপর নর্ত্তকী তরুণীরা চলে গেল একে একে স্বগৃহে ছায়া-ঢাকা বনপথ ধরে। তেমন ঘোর অরণ্যেও একাকিনী যেতে এরা ভীত হয় না। আত্মরক্ষার অস্ত্র তো সঙ্গেই থাকে—আততায়ী পশু হোক মানব হোক, তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে এরা পশ্চাৎপদ হয় না যে কোন অবস্থায়ই। তা ছাড়াও নারী-নির্য্যাতনকারীর সামাজিক শাস্তি এদেশে শিরশ্ছেদ তো রয়েছেই।

মীড্ আমার বললে—আর একদিনের পথ গেলেই নৌকা বিদায় দেওয়া হবে। আবার ভালো পথ পাওয়া যাবে সাইকেল চালনায়।

আমার তাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। নৌকায় চলতে আমার কোন অসুবিধাই হয় নাই। হয়তো সঙ্গীদের নৌকাপথ ততটা পছন্দ নয়, তাই নৌকাপথের সমাপ্তিতে ওরা হয়েছে আশান্বিত।

সেদিন সন্ধ্যায় যেখানে আমরা নৌকা ভিড়ালাম, সে বাড়িতে উঠে দেখি তখনও গৃহস্বামী আর তার পত্নী বাঁশের চাঁচাড়ি দিয়ে চাটাই বুনছে। আমাদের দেখে তাদের কাজ ক্ষান্ত করে আশ্রয় স্থানে নিয়ে গেল। সেটা কামনানের বাড়ির সংলগ্ন একটা ঘর।

তারা দুঃখ করে বল্লো—এ গ্রামে বৌদ্ধ-মঠ নেই, পাশের গাঁয়ে আছে, এত দূরে অতিথিকে আশ্রয় দিলে অতিথিদের কষ্ট হবে।

বিপুল দেখলাম এ গ্রামের [illegible] বিপুলের পা-[illegible] না হয় সংবাদদাতা। [illegible] করলাম পরের দিন এখানেও মাছ ধরতে [illegible] জোয়ারের জল এ খালেও হু-হু শব্দে ঢুকছে। সাইকেলের পথে আর সে সুযোগ হয়তো জুটবে না।

পর দিন ভোর বেলা নৌকার ভাড়া চুকিয়ে দেওয়া হলো। মাঝিরা নমস্কার্ জানালো। আমি এক প্যাকেট সিগারেট তাদের উপহার দিলাম। তারা চলে গেল। কিন্তু পরে বিপুলের কাছে শুনলাম মাঝিরা সিগারেট খায় না, খায় পান। তারা সিগারেট হয়তো কোন আরোহীর নিকট বিক্রয় করবে।

মাছ ধরার কথা ভুলি নাই। একটা ছোট জাল যোগাড় করে লাঠির ডগায় জুড়ে নিয়ে মাছ ধরবার সভ্য কৌশল আবিষ্কার করলাম। ঘণ্টাখানেক পরিশ্রমের পর আমাদের এক দিন চলবার মত মাছ ধরতে পেরেছিলাম, কারণ এখানে বেশি মাছ আনাগোনা করে না।

সেদিনটা সেখানে কাটালাম। বিকালে পল্লীপথে বেরিয়ে দেখি এ গাঁ-টা গত কয়দিনের মত জুলি-নালায় পূর্ণ নয়, মাঠও নীচু নয়। এ অঞ্চলের চেহারাই অন্য রকম। প্রত্যেক বাড়িতেই দুটো একটা আম গাছ আছে। নারিকেল গাছ প্রচুর। একরকম হলুদ রংয়ের ফুলের গাছ সব বাড়ির সমুখে সমুখে।

সন্ধ্যায় কামনানের বাড়িতে হলো মেয়েদের নাচ। এ মেয়েদের কারু বার-তের বছরের বেশি বয়স নয়। কিন্তু ফ্যাশান যেন শহুরে। কামনানকে ধন্যবাদ দিলাম।

বিপুল বল্লে—ব্যাঙ্কক আর খুব বেশি দূর নয়। চার'শ মাইল হবে। প্রতিদিন সত্তর-পঁচাত্তর মাইল সাইকেল চালাতে পারলে সাত দিনের বেশি লাগবার কথা নয়। কালই বেরোনো যাক্, কি বলেন?

—না হে ভায়া, কাল নয়, পরশু যাবো। জালটি তৈরি করেছি কালও এখানে টাট্কা মাছ খেতে চাই।

সাইকেল পথে চলেছি। পথটি সত্যই সুন্দর। কোন দিকের ঝড়ো হাওয়াই আর আমাদের গতিবেগে বাধা দিতে পারে না। আবার সাইকেল দূর থেকে

দেখেই পথচারীরা আপনি সরে দাঁড়ায়। আরামেই চললাম। প্রথম দিন সাইকেলে পঞ্চাশ মাইলের বেশি চলা গেল না। গ্রাম একটা পেলেই আশ্রয় নিলাম। বিশেষ করে [illegible] বৃষ্টি হলো। [illegible] আর লজিং হাউস [illegible]

এ গ্রামে [illegible] বেশি। তারাই ব্যবসায় চালায়, কারণ জমির মালিক যারা [illegible] পারে না, চাষও করে না। প্রত্যহ সকাল বেলা বাজার বসে। প্রতি গৃহ থেকেই কিছু-না-কিছু বিক্রয়ের জন্য বাজারে হাজির করা হয়, আর কিছু না থাকলে অন্ততঃ পিষ্টক (বিশেষ করে মালপোয়া, পুলিপিঠে) বিক্রি করতে যায়। পিষ্টক কিনে ক্রেতারা বাজারে বসেই খায়।

হাঁস মুরগী ছাগল প্রভৃতি বাজারে বিক্রয় হয় না। সে দোকান-ঘর অন্য স্থানে মলয় বা চীনাদের পরিচালিত। দোকানের জমিটুকু ও কসাই ব্যবসা দু-ই সরকার বা গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সঙ্গে চুক্তি করে নিতে হয়। গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ এ থেকে যে ভাড়া পায় তা গ্রামের পরিচ্ছন্নতার জন্যই খরচ করে।

শ্যামদেশে মেথর নাই, ঝাড়ুদার আছে। গ্রামেও ঝাড়ুদার রয়েছে, পথ ঝাঁট দেওয়া, বাজার পরিষ্কার রাখা তার কাজ। কিন্তু ঝাড়ুদার বলে সে অপাংক্তেয় নয়। অন্য দশজনের সঙ্গে সমাসনে বসে পানাহার করবার অধিকারী সে, জাতি বিচার কেউ মানে না।

হাইজাই থেকে যাত্রার পর, যে সকল গ্রামে গিয়েছি, ভিক্ষু বেশি নজরে পড়ে নাই ক্বা ছাড়া। কিন্তু এ গ্রামে ভিক্ষুর সংখ্যা বিস্তর। ভিক্ষুরা যখন বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করতে যায়, তখন পুরুষরাই অন্ন ভিক্ষা দেয়। পুরুষ কেউ না থাকলে বর্ষীয়সীরা ভিক্ষা দেয়। সেজন্য সে সব মহিলার মাথার চুল লম্বা থাকে না, কোন প্রসাধন বা অলঙ্কার থাকবে না। যুবতীরা তো ভিক্ষুকে দেখাই দেবে না, পাছে ভিক্ষুর লালসার উদ্রেক হয়।

শ্যামদেশে নারীর বিবাহ হলে পর আর মাথায় লম্বা চুল রাখবার নিয়ম নাই। ওরা গলায় কি হাতে কোনো গহনা পরে না।

দুদিন এখানকার লজিং হাউসে বিশ্রাম করে তৃতীয় দিনে যাত্রা করবো, এমন সময় ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলো। যাত্রা স্থগিত। ঘরের বার হওয়া যায় না। বিপুলের সঙ্গে শ্যামদেশের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করলাম।

—দেখুন মিঃ বিশ্বাস, ইউরোপীয়রা ইতিহাস রচনা করেছে যে, মধ্য-চীনের লোকেরা অতি প্রাচীন কালে এদেশে এসে [illegible] বলে যে অষ্ট্রো-এশিয়াটিকরা [illegible] পারে নাই, থুন-থাইদের [illegible] রাজ্য স্থাপন করলো কে। যেভাবের [illegible]

—তা তো বলবেই, নইলে যদি থাইরা ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের ইতিহাস জেনে ভারতের শক্তি বৃদ্ধি করে, তাকে স্বাধীন হতে সহায়তা করে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের এ চতুর ভেদ-সৃষ্টির কৌশল। আমাদের বাংলা দেশেই কি ওরা কম কারসাজি করেছে—অহোমদের, ওড়িয়াদের বাংলা থেকে স্বতন্ত্র করে রাখতে। তারপর চেষ্টা করেছিল পূর্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গকে পশ্চিম বঙ্গ হতে আলাদা করতে প্রাচীন ইতিহাসের দোহাই দিয়ে, বরেন্দ্র রিসার্চ্চ, বল্লাল রিসার্চ্চ এ সব দিয়ে। কিন্তু উত্তর এবং পূর্ব্ব বঙ্গ সে ধাপ্পা ধরে ফেলে। পারে নাই অহোমরা, পারে নাই ওড়িয়ারা সেরূপ মুক্তদৃষ্টির মালিক হতে।

—তা হলে প্রাচীন শ্যামবাসীরা কোথা থেকে এল মনে করেন ?

—আমি যতদূর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তাতে বলতে পারি ব্রাউন মঙ্গোলিয়ানদের অভিযান দক্ষিণ হতে উত্তরে। সমগ্র মলয়ের সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ ছিল স্থলভাগে সংযুক্ত—আজকেকার সাগর ব্যবধান সে দিনে ছিল না। এরাই শ্যাম হয়ে চীন পর্য্যন্ত গিয়েছিল এবং ভারতের সভ্যতা বিস্তার করেছিল।

—চীনে তো ভারত-সভ্যতা স্থান জুড়ে নিয়েছিল, সকল চীনাই তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে।

—তবে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় কিছুটা যেন নিগ্রো মিশ্রণও আছে (অষ্ট্রেলিয়া হতে হয়তো), তোমাদের বৃদ্ধ-বৃদ্ধার জরাজীর্ণ আকৃতি হুবহু নিগ্রো ডৌলের। কিন্তু তোমাদের দেহে-মনে ভারতের ছাপ। থাই-নারীর স্বাধীনতা ভারতীয় বৈদিক সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য (স্বাধীন ভর্তৃকা) বলে প্রচারিত নারী-সমাজেরই উত্তরাধিকার। তা ছাড়া ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতিহাস ধর—বিদ্রোহের ফলে যে ভারতীয় সভ্যতার বাহক সুখ-থাই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, তার সঙ্গে ভারতের ক্ষত্রিয়দের বাহুবলই পরে যোগদান ক'রে শ্যামকে করে দুর্দমনীয়, আজকেকার রাজবংশে সেই ক্ষত্রিয় রক্তের প্রবহণ, তাই শ্যামের রাজা, শ্যামের প্রজা মাছ-মাংস প্রিয়।

—ও: আপনি দিগ্বিজয়ী বীর রাজারামের অযোধ্যা রাজ্য সৃষ্টির কথা বলছেন। দুঃখের বিষয় শ্যাম সরকার এ রাজার কীর্ত্তি-কাহিনী সম্বন্ধে কোন পুস্তক প্রকাশ করতে কি গবেষণা করতেও দেয় নাই সেকাল থেকেই। তবু কতকগুলি ভিক্ষু ও-কাহিনী পদ্য-ছন্দে রচনা করে চারণ-গায়কদের মুখে মুখে শেখায়, আজও সে গান অনেক ভিক্ষু-চারণের মুখে শুনা যায়।

বেলা বেশ হয়েছে। রান্না প্রস্তুত, আমরা স্নানাহারে মন দিলাম। খেতে বসে মীড্ এর সঙ্গে কথা হলো পুরাতন সে অযোধ্যা রাজ্য দেখা যায় কি না সে সম্বন্ধে। মীড্ বললে,

—পারা যাবে না কেন দেখ্তে। আমরা একটু ঘুরে গেলেই হবে, সোজা ব্যাঙ্ককে না গিয়ে। ব্যাঙ্কক থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল উত্তরে অযোধ্যা। কিন্তু বেজায় জঙ্গল, সাপ-বাঘের আস্তানা। প্রাসাদ মন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দেখা যাবে না। তবে শহর-টা যার নাম আধুনিক অযোধ্যা, সেটা দেখ্তে পাবেন।

কি দেখ্বো জানি না, কিন্তু প্রাণের ভিতর পুলক-পরশ এল অযোধ্যা নামটা শুনেই। সেকালের লোকের ওটা রীতিই ছিল সারা দুনিয়ায়। দুঃসাহসিকেরা নতুন দেশে গিয়ে, স্বদেশের মান বাড়াতে চাইতো স্বদেশের নামে নতুন দেশের নামকরণ করে। নিউ ইয়র্ক, নিউ জিল্যাণ্ড, নিউ সাউথ ওয়েল্স, ইষ্ট লণ্ডন তো সেদিনের নামকরণ। শ্যামে 'অযোধ্যা' রাজ্য তাই ভারতীয়ের বিজয়-স্তম্ভ। সেখানে সভ্যতার নেতা-নিয়ন্তা ছিল ভারত।

পরের দিন থেকে পথযাত্রায় মন দিলাম। খুব ভোরে রওনা হই, দুপুরে যে কোন লজিং হাউসে বিশ্রাম, স্নানাহার। আবার পথে, সন্ধ্যায় যেয়ে আশ্রয় নেওয়া হয় মঠে, লজিং হাউসে বা কারু বাড়িতে। এদিকে যেমন ভিক্ষুর দেখা পেয়েছি তেমনি পেয়েছি বিলম্বরিয়া চীনাদের সাহায্য, সহানুভূতি। ভারতীয়ও যে দুটি একটির সাক্ষাৎ মিলে নাই এমন নয়।

তিন দিন এভাবে প্রায় সত্তর মাইল করে সাইকেল চালিয়েছি উত্তর-পশ্চিম মুখে তারপর উত্তর-পূর্ব মুখে একদিন। এভাবে চল্তে পার্লে আর দুদিনেই পাবো অযোধ্যা। অযোধ্যার টান্ আমার অন্তরকে করেছে উতলা। দু এক জায়গায় জরা পেলাম, কিন্তু তাতে থেমেও উৎসাহ জাগে নাই।

সেদিন জায়গা নিয়েছি একটা চীনা লজিং হাউসে। খেতে বসে মীড্ জানালো আজ সাপ-মাছ ব্যবস্থা হয়েছে চমৎকার, রান্না করে দিয়েছে চীনা

ম্যানেজার-পত্নী। মনে হলো ওরা আমাদের বাম্ মাছকেই ও-নাম দিচ্ছে। খেতেও লাগলো বেশ মোলায়েম। আমাদের দেশে বাম মাছ একটু শক্ত-শক্তই হয়, এমন নরম হয় না।

খাওয়া প্রায় শেষ। খেয়েছি খুব। কিন্তু গা বমি-বমি করছে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। কিন্তু ন্যাকার উঠে গেল। যা খেয়েছিলাম তা তো পড়লোই, গলা চিরে একটু রক্তও উঠ্‌লো। বিপুল এনে ঔষধ বলে তার সামনে মত এক গ্লাস দিল। রাতটা এক ঘুমেই কেটে গেল, কিন্তু শরীর দুর্বল। মনে হলো পেট গরম হয়েছে।

সে দিন আর আমরা বেরোলাম না পথে। পেট গরম, একটু ঘোল বা দই পেলে মন্দ হতো না। কিন্তু সে পাট চীনাদেরও নাই, শ্যামদেরও নাই। খেলাম ফেনভাত, সারাদিন বিশ্রাম।

রাতে শুয়ে শুয়ে বিপুল বল্‌লে—

মিঃ বিশ্বাস, একটা কাজ বড় অন্যায় হয়ে গেছে। কাল আপনাকে সাপ-মাছ দেওয়া ঠিক হয় নাই। বলে দেওয়া উচিত ছিল ওটা মাছ নয় সাপই।

—বল কি! [পেটের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠ্‌লো।

—ক্ষমা করুন। মনে করেছিলাম আপনার রুচিকর হবে। শ্যামরা, চীনারা সবাই তো খায়।

আর কথা বল্‌লাম না। দাঁত-মুখ খিচে রইলাম। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। দু' দিন আর কোন কথা নাই—কেবল পথ আর পথ। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় পেলাম বান-পং গ্রাম।

গ্রামে ঢুকতেই একটা বাগানে দেখি তিনটি মেয়ে একটা গাছকে তাগ্ করে ছোরা নিক্ষেপ করছে। চিহ্নিত স্থানে লাগাতে পারছে না। আবার কুড়িয়ে নিয়ে সেই ত্রিশ ফুট দূর থেকে ছুড়তে গেল। হুঁ। প্রাকটিস হচ্ছে।

নানান জাতের লোক গ্রামে। এমন কি কয়েক ঘর জাপানীও আছে, তারা দীর্ঘকাল এদেশে থেকে শ্যামবাসী বনে গেছে, তবে খৃষ্টান, রোমান ক্যাথলিক। এরা দুধ-দই খায়, থাকে অতি পরিচ্ছন্নভাবে। ইংরেজীও বেশ বলে। এদের সঙ্গে মিশে গেলাম। ওরাই আমাকে খাওয়াতো ভারতীয় রান্না—মাছ, মাংস, দই, দুধ।

বিপুল আর মীত্ কিন্তু সেটা পছন্দ করতো না, বলতো—'এরা পর্ত্তুগীজদের গোলাম'। একজন ভারতীয় মুসলমানের দেখা পেলাম। তিনি বেশ শিক্ষিত। তিনি বল্লেন—

ওলন্দাজ ও ব্রিটিশের আগে এদেশে আসে পর্ত্তুগীজ, তারা কতকগুলা জাপানী ক্রীতদাস এনেছিল, তারাই এসব জাপানী খৃষ্টান্। তাই এ:দের মেজাজ নরম। ধর্ম নিয়ে জুলুমের ভয়ে ওরা দেশে ফিরে যায় নি। সে সময়ে মিকাডোর মতি-গতি ছিল খৃষ্টান-বিরোধী।

যে জাপানীদের সঙ্গে বান-পং-এ আমার ভাব হয়েছিল, তারা বল্তো—

আমাদের দেশেও ভারতীয় ধরণে কতকটা জাতিভেদ দেখা দেয়। আমরা জাত বিচার মানিনি। তাই প্রবল সামুরাই পার্টির অত্যাচারে আমরা দেশত্যাগী। সেজন্য দুঃখিত নই আমরা। এখানে বেশ আছি, থাইদের মত ই স্বাধীন। কেউ ধর্ম্মের জন্য বা বিদেশাগত বলে নির্য্যাতন করে না।

কিন্তু দেখলাম লক্ষ্য করে জাপানীদের গায়ের রং বাদামী হয়ে শ্যামদের কাছাকাছি এসেছে। দুদিন এখানে আনন্দেই কাটালাম।

বান-পং থেকে সোজা পূবমুখে গেলে এক দিনেই ব্যাঙ্কক পৌছাতাম। কিন্তু অযোধ্যা আমাদের টেনে নিয়ে গেল। রাস্তা প্রথমতঃ সোজা উত্তর প্রায় দেড় শ' মাইল, তারপর পূবদিকে সত্তর-আশি মাইল। তবে পাওয়া গেল অযোধ্যা।

বান-পং থেকে উত্তর-পশ্চিমে পঞ্চাশ মাইল গেলে পাওয়া যেত 'কাঞ্চনা বুরী' (কাঞ্চন-পুরী), সে পথে যাই নাই। জায়গাটার কোন বিশেষত্ব নাই।

অযোধ্যায় পৌছে দেখি সেটাও মামুলি একটা শহর। কোন বৈশিষ্ট্য-আড়ম্বর নাই। চীনা আছে তবে থাইয়ের সংখ্যা বেশি মনে হলো। অন্য শহরের মত ভিক্ষুর বাড়াবাড়ি নাই। মঠ একটা রয়েছে, আধভাঙ্গা গোছের। ভিক্ষু বুঝি এখানে বিশেষ সুবিধা পায় না।

লজিং হাউসে আছি। এখানেও একজন ভারতীয় এলেন। তিনি আমায় দেখে হেসেই সারা—এ কি মোরমবি!

—চটবেন না ভাই রামজী! অযোধ্যা নামটা শুনে এখানে এসেছেন তো রাজারামের বাহাদুরি দেখতে। আমিও তেমনি কত আশা করে এসেছিলাম এখানে। নামটাই ফাঁকি। থাইদের ধোঁকাবাজি, সব মুছে দিয়ে নামটা রেখেছে ভারতকে বিদ্রূপ করতে। এমন দেশে মানুষ আসে।

আমার সহ্য হলো না। স্পষ্টকথা বলে দিলাম—আপনি তো বেশ লোক। যে দেশ আপনাকে দিল অসময়ে আশ্রয়, তারই খোয়ার কাটছেন। বেতের মলয়ে টের পেতেন কত ধানে কত চাল। থাইরা তো আপনার কোন অনিষ্টই করে নি!

—সে কথা তো ঠিকই। তবে আমার কথা হলো থাইদের উচিত ছিল রাজারামের অযোধ্যারাজ্যের যে ধ্বংস-স্তূপ রয়েছে, সেটা প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকে রক্ষণ করে পরিদর্শকদের দেখার যোগ্য পথ-ঘাট-পাহারা ব্যবস্থা করা।

—ওরা তো প্রাচীনের পূজারী নয়।

—তবে বৌদ্ধ-ভিক্ষু কেন আছে?

—সেটাও তো ভারতেরই অবদান ভুলে যান কেন?

—তবু হিন্দু তো নয়, রাজারামের সব কিছু বর্জন।

—নাঃ, এবার ধর্ম-কলহে এলেন। ও-ভাব পোষণ করবেন না, ওটা সাম্প্রদায়িকতা, দুনিয়া তা পেছনে ফেলে এসেছে।

ভদ্রলোক প্রায়ই আসতেন। একদিন মীডের সঙ্গে তাঁর কি পরামর্শ হলো। আমার কাছে তাঁরা প্রস্তাব করলেন—

সাহস থাকে তো কাল চলুন আমার সঙ্গে একেবারে ধ্বংস-স্তূপের বনে। একটা আশ্চর্য্য জিনিষ দেখতে পাবেন। কিন্তু যেতে হবে গৈরিক বসনে।

বিপুল মত দিল না। আমি কি করবো ঠিক ঠাওরাতে পারি না। কিন্তু মীড আর ভারতীয় ভায়া রেহাই দেয় না। বিকাল বেলা তারা নিয়ে এল এক মলয়-তান্ত্রিক। সেও বনে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক আমাদের সঙ্গে। সে বললে—

বনে জোঁক, সাপ বেজায়। আমরা যেখানে যাবো, সেখানে বাঘ বড় একটা আসে না, থাকে ভিতর-বনে। আমরা যাবো মাত্তর ক্রোশটাক। তবে গৈরিক বা রক্তবস্ত্র পরে গেলে সাপ-বাঘ দূরে সরে যায়। এ আশ্চর্য্য। আমি আরো তিন-চার বার গেছি।

তবু আমি রাজি হই না দেখে ওরা টিটকারী দিল আমার ভীরুতা নিয়ে, আমার নিজ দেশীয়ের কীর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধার অভাবের কারণে। শেষটায় অনেক ভেবে-চিন্তে রাজি হলাম।

পর দিন রক্তবস্ত্র এনে দিল তান্ত্রিক। আমরা বেলা আটটায় চারজনে রওনা হলাম হেঁটে। বিপুল বললে—বেলা চারটের ভিতর ফিরে না এলে

বুঝবো বিপদে পড়েছেন, তখন পুলিশে খবর দেব। আর আমাদ্বারা কিছু সম্ভব হবে না। বিদায় মিঃ বিশ্বাস।

মনটা দমে গেল। ক্রমে আমরা শহর ছাড়ালাম। ফাঁক ফাঁক বন। একটা আবছা পথরেখা, একেবারে আনকোরা আকাঠ বন নয়। একটু ভরসা হলো। এমন সময় একটা সাপ, ওদেশে বলে—কালনাগিনী, আমাদের দেশের শাঁখনী সাপের মত দু-মুখো, কিন্তু কালো। দেখেই তান্ত্রিক আর মীড্ ভয়ে ঘুরে সরে গেল দশ হাত। আমি আর ভারতীয় ভায়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওটার ধীরগতি লক্ষ্য করতে লাগলাম। এ সাপ আমাদের দেশে আছে, লোকে বলে অন্ধ, ওটা অন্য সাপ খায়, সেজন্য আমাদের দেশে ও-সাপকে কেউ মারে না। সাপও মানুষকে তেড়ে আসে না।

মাইল খানেক যাবার পর তান্ত্রিক তার ঝোলা থেকে মশাল বার করে ধরিয়ে নিল। একেবারে অন্ধকার নিবিড় অরণ্য। পা-পা করে হচ্ছি অগ্রসর চারদিকে নজর বুলিয়ে। কোন ভয় করতে মানা করলে মীড্। তার সঙ্গে নাকি অস্ত্র রয়েছে ভীষণ। এমন সময় কোথা থেকে দুটি ভিক্ষু এসে আমাদের দলে যোগ দিল। তারা আগে আগে চললো।

একটা ভীষণ ঝোপ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ জুড়ে। ওখানেই নাকি প্রবেশ করতে হবে। সারা বন কাঁপিয়ে উঠ্‌লো বাঘের ডাক। মীড্ তাড়াতাড়ি কি একটা জিনিষ ছুড়ে দিল। সেটা বিরাট একটা গাছের গোড়ায় পড়ে প্রচণ্ড শব্দে হলো বিস্ফোরণ। ধোঁয়া বেরুলো, বারুদের গন্ধ। মোটর-বোমা নিশ্চয়।

মুহূর্ত্ত পরে সব নীরব নিথর। গর্জ্জন নাই বাঘের। আমরা ঝোপের ভিতর ঢুকে পড়লাম। একটা পড়ো মন্দির। মানুষ এ-স্থানে বাস করতে পারে না। তবে আমরা এলাম কি দেখতে?

ভিক্ষুরা ভিতরে গিয়ে মোমবাতি জ্বালালো। সে মিট্‌মিটে আলোতে কিছুই ঠাহর হলো না। তবে মন্দিরে কোন বিগ্রহ নাই, মন্দের ভাল। নিমেষে মন্দিরের অভ্যন্তর থেকে অভিবাদিত করে এল বাণী—স্বাগতম্!

পরিষ্কার সংস্কৃত উচ্চারণ শুনে আমি জবাব দিলাম—নমস্কার! নমস্তে!

আবার বাণী হলো—পীড়াপীড়ি ক্ষত্রে নরঃ।

শব্দ অনুসরণ করে চেয়ে দেখি এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, নগ্ন, যেন অপচ্ছায়া। কিন্তু এমন আসন জুড়ে বসা যে পরণে কিছু আছে কি নাই মালুম হয় না।

মাথায় নাই একগাছিও চুল, গোঁফ-দাড়িও যেন ঝরে পড়েছে, দাঁত নাই একটিও। লোলচর্ম।

সকলেই বসলো, আমিও বসে গেলাম। তান্ত্রিক এনেছিল ফল-মূল-পিষ্টক, তাই এগিয়ে দিল। বৃদ্ধ হাতে তুলে নিল একটি ফল, খেল না, বাকিগুলো আমাদের বিতরণ করতে ইঙ্গিত করলো। ভিক্ষুরা দিল হাতে হাতে, নিজেরাও নিল।

বৃদ্ধ শ্যামভাষায় বলে চললো—এত কষ্ট করে তোমরা এলে কেন? কি হবে আমার কথা শুনে। আমার তো সবই সেকেলে, একালের লোক তা চায় না। থাকি আমি একেলা এখানে 'মার'-এর পরিকর সাপ-বাঘ নিয়ে। ওরা ভাল, বিদ্রোহী হয় না, চড়াও হয় না।

ভারতীয় বললেন—দয়া করে আপনি সে পুরাতন গানই করুন, আমরা আবার শুনবো, আমাদের ভারতবাসী ভাইটি নবাগত, তিনি শুনবেন, দেশে ফিরে বলবেন একথা দেশবাসীকে।

—থামো, থামো, আমায় লোভ দেখাচ্ছ হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ভিক্ষুদের কি ইঙ্গিত করলেন, তারা নিয়ে এল বাঁশের তৈরি একটা বীণ জাতীয় তার-যন্ত্র। যন্ত্রটি হাতে নিয়ে বৃদ্ধ এক ঝঙ্কার দিলেন, গম্ গম্ করে উঠলো মন্দির। বৃদ্ধের কঙ্কালসার আঙুলে এত ক্ষমতা কোথা থেকে এল!

কিছুক্ষণ মনে মনে সুর আওড়ে বৃদ্ধ যখন শ্যামভাষায় তান ধরলেন, মনে হলো, কত কত শতাব্দীর জমাট অশ্রু যেন আজ মরজগতের আলোতে বিগলিত হয়ে পড়ছে শব্দ-তরঙ্গে।

রাজারাম, রাজপুত্র থিবো, অযোধ্যা, পক্ষীরাজ ঘোড়া, ব্রহ্মদেশ জয়, সুখথাই রাজ্য জয়, ওঙ্কার বট, চম্পা, কম্বোজ জয়—এ সব কথা বেশ বুঝলাম। ভারতের অযোধ্যায় রাম-রাজত্বের নাম অনুসারে শ্যামের অযোধ্যায় রাজারাম। সকল প্রজাই সেই রাজারামকে ভগবান জ্ঞানে পূজা করতো। শুনে অবাক হলাম। প্রত্নতাত্ত্বিকরা তো রাজ-পাদুকা-পূজার কথা বলে ('মলয়েশিয়া ভ্রমণ' দেখুন)। আশ্চর্য্য মিল।

কতক্ষণ গান চলেছে খেয়াল নাই। মনে হলো অনেকক্ষণ। হঠাৎ সুর থেমে গেল, গান বন্ধ হলো। কিন্তু সুরের রেশ তখনও স্পন্দিত করছে প্রাণের তারকে। আমরা একেবারে নিথর হয়ে বসে রইলাম। অবচেতন সত্তায় বাস্তবের পরশ লাগলো বৃদ্ধের বাক্যে—

আর কি? অযোধ্যা-রাজ্যের বৈশিষ্ট্য বুঝ্‌লে তো? এবার ঘরে ফিরে যাও। আর এখানে এস না, দেখা পাবে না। আমার আর বেশি সময় নেই এ রাজ্যে।

—যাবেন কোথা?

—নিজের ঘরে।

—সে কোথায় আবার?

—সে স্থানের কোন নাম নাই, রূপ নাই। নাম-রূপহীন অনির্ব্বচনীয় সে।

—আচ্ছা, আপনি হিন্দু, না বৌদ্ধ?

—আমি আমিই, আমাতে হিন্দু নাই, বৌদ্ধ নাই, খৃষ্টান নাই, অথবা সব কিছুই আছে।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কণ্ঠে যেন বিশ্বকবির স্বর—

'যেথা নাই নাম,
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষের পরিচয়,
নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে,
যেখানে অখণ্ড দিন
আলোহীন অন্ধকারহীন,
আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর সঙ্গমে।'

জ্ঞান-[illegible] অন্ধকারের বুকে জ্বলন্ত ছুঁচ ফুটায় তার কথার খেই পাওয়া ভার। [illegible] এক বিন্দু।

এমন [illegible]। আমি রওনা হতে ব্যস্ত দেখে সঙ্গীরাও উঠে পড়লো। [illegible]—আর এস না, আসা-যাসি খতম করো।

[illegible] কাঁঠাল গাছে বেধড়ক ফলে আছে। অথচ সেটা [illegible]

[illegible] চোখ দুটো ভয়ানক। তা ছাড়া এত [illegible] চাঁচাছোলা।

—[illegible] কি বললে ঠিক বুঝলাম না।

—শুনুন তবে কি গান গাইলো। ভারতের অযোধ্যা-রাজের অনেকগুলো ছেলে ছিল। এক ছেলে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে সারা দুনিয়া ঘুরতে বেরোলো। ব্রহ্মদেশে এসে সে রাজা হয়ে বসলো অনেকগুলো রাণী বিয়ে করে। সেদেশে তাকে বল্‌তো রাজা থিবো (ভারতীয় শিব)। এক রাণীর ছেলে হলো পরম সুন্দর, কিন্তু নাক তার রাণীদের মত চেপ্টা নয়, টিকলো। অপর এক রাণী সরু নাক অপয়া মনে করে সে ছেলেকে মেরে ফেল্‌লে। সপত্নীর ঈর্ষা ভেবে থিবো সে দেশ ত্যাগ করলো।

আবার ঘুরতে ঘুরতে শ্যামদেশে এল। এসে দেখলো এদেশের নারী অপরের ছেলেকেও নিজের ছেলের মত দেখে। থিবোর মনের মত দেশ। ব্যাঙ্কক দখল করে সে পঞ্চাশ মাইল উত্তরে রাজধানী স্থাপন করে, নাম দেয় অযোধ্যা। প্রজারা তাকে রামায়ণের রামের নামে রাজারাম আখ্যা দিল। বীর রাজারাম প্রথম জয় করলো দেড়শত বছরের পুরাতন সুখ-থাই রাজ্য, তারপর ওঙ্কার বট, চম্পা, কম্বোজ। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া তার অধীন হলো।

—এখন বুঝ্‌লাম কেন থাই-নারী এত স্বাধীন।

শহরে ফিরে বিপুলকে বল্‌লাম বৃদ্ধ ভিক্ষুর রাজারাম কাহিনী কীর্ত্তনের কথা।

বিপুল বল্‌লে—ও সবই মলয় তান্ত্রিকটার হিপ্‌নোটিজ্‌ম্‌।

মীভ বল্‌লে—তা কি করে হবে। পথে সাপ, ভিক্ষুণী, শেষ বাঘের ডাক, মায় ফল-পিষ্টক খাওয়া। আর এরকম গান তো এখানকার তরুণ ভিক্ষুরাও করে থাকে। সেজন্ত ওদেরে কেউ পাছন্দ করে না, ওরা সেক্যুলের দিকে ফিরে তাকিয়ে আছে। কিন্তু বুড়া উদার। সব তার সমান। তাই পেরেছে সাপ-বাঘকে বশ করতে। এ-ও সাম্যবাদ।

বিকালের দিকে ভারতীয় ভায়া এসে কথায় কথায় বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রশস্তি জানালো—মুখে পাগলামি করলেও মনে মনে সে হিন্দু, রামভক্ত। বিশ্বচরাচর সবই তার কাছে রাম, রাম ছাড়া কোথাও কিছু নেই। ভারতের অদ্বৈত সাধনা তার। সে যে-সে লোক নয়, মাসে একদিন ভাত খায়, ভিক্ষু চেলারা দিয়ে আসে। নইলে খায় শুধু কাফি-গাছের লাল লাল ফল আর জল।

—আমার ভাল লাগে এজন্তে যে সে কোন বিগ্রহ-পূজারী নয়, সব ধর্ম্মই সমান তার কাছে। ধর্ম্মান্ধতা নেই, উদার।

সেদিন সন্ধ্যার পর বিপুল আবার শ্যামের ইতিহাস শোনাল—'চারণের গান তো সেদিন আর নাই, কিন্তু শ্যামের ওপর বিদেশীর অভিযান একটুও [illegible] নয়। কন্সটান্টাইন ফলকান নামে এক গ্রীক পর্যটক এসে রাজার [illegible] হয়। তাতে রাজা তখন 'নরাই'। ফলকানের প্রভাবে ফরাসীরা অযোধ্যায় উপনিবেশ স্থাপনের অধিকার পায়। তারা গোপনে কেল্লা তৈরি করে সৈন্য-সংখ্যা বাড়াতে থাকে। রাজা নরাই খৃষ্টধর্মে ঝুঁকে পড়েন, বুঝি বা খৃষ্টানই হয়ে যেতেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। নতুন রাজা অগোণে ফরাসীদের উচ্ছেদ করেন শ্যাম থেকে। পর্যটককে হত্যা করা হয়।

কিন্তু নির্মম নিপীড়ন করে মগ (অর্থাৎ ব্রহ্মবাসী)। মগরাজ আলাংপায়া ক্রমে চিংমাই, লুয়াংপ্রবাং জয় করে অযোধ্যা অবরোধ করে। দু বছর পরে অযোধ্যার পতন হয়। মগরা শ্যামদেশকে করে পদানত। বহুকাল পরে শ্যামরা বিদ্রোহী হয়ে মগদের তাড়ায়। ইতিহাসে আছে বাংলা দেশে মগ জলদস্যুর অত্যাচার কম ছিল না সেকালে, শ্যামেও তেমনি মগদের নাম দেশবাসী শঙ্কার সঙ্গেই স্মরণ করে।

আমি বললাম—এত শক্তির অধিকারী হয়েও মগরা পরাজিত হলো। দেশজয় করা সহজ, কিন্তু দেশবাসীর মন জয় করা সোজা নয়। আর তা করতে না পারলে বিদ্রোহী একটা জাতিকে বেশি দিন পদানত রাখা যায় না। তাই বুঝি মগরা হলো বিতাড়িত। হয়তো তখনই থুন-থাইয়ের জনমত রাজাকে করে রাখলো জনগণের আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধি—জনগণের ভাগ্যবিধাতা নয়। এখানেই শ্যামের বিশেষত্ব।

—সেকাল থেকেই শ্যামবাসী স্বাধীনতার অনুপিটে। আপনি ঠিক ধরেছেন, রাজা হলো [illegible] অনুগতের আজ্ঞাবহনকারী।

—এদিকে, [illegible] মগ জলদস্যু আর আরব বোম্বেটের ঝাপটে, বাংলা [illegible] হলো [illegible]। [illegible] হয়েছে রাজনৈতিক বন্ধু। আর [illegible] রাজনৈতিক [illegible] শক্তি এদেশে। ভারতেও ছিল এ দুর্ভাগ্য, কিন্তু [illegible] (বিশেষ করে আরব) কূটনীতি, পরে শ্বেত প্রতারণা [illegible] করে দিলেন [illegible] ভারত পরাধীন।

—তবু ভারতের [illegible] নয়, রক্ত-বন। একদিন না একদিন তা [illegible] আত্মপ্রকাশ করবে। সে সূচনা তো দেখা যাচ্ছে।

—আর শ্যামের স্বাধীনতা কত যুগের পুরাতন। কিন্তু বর্মীরা বিতাড়িত হলো কি ভাবে ?

—সে হলো টেক্ শিং নামে এক সেনাপতির বিদ্রোহের ফলে। সে-ই জনগণকে বিপ্লবে আনে। মগরা পলায়ন করে। ব্যাঙ্ককের কাছে মেইনাম নদীর তীরে তার নতুন রাজধানী হয়—ধনবুরী (ধন অর্থাৎ কাঞ্চন পুরী)। কিন্তু টেক্ শিং স্বেচ্ছাচারী, তাকে শ্যামবাসী সহ্য করলো না, গোপনে বিষদানে উন্মাদ করে দেয়। সেনাপতি চোললক উন্মাদকে হত্যা করে সিংহাসনে বসে। সে বংশধারা আজও চল্‌ছে।

—দক্ষিণ ভারতের রাজা প্রথম ও দ্বিতীয় রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গে নিশ্চয় নিকট সম্বন্ধ, তাই থাই-নারীর কাছা দিয়ে শাড়ি পরা দক্ষিণ ভারতের রীতিতে। চৌলুক্য রাজবংশ সে সময় পরাক্রান্ত ছিল। চোল রাজ্য হতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য 'ধর্ম্মমহামাত্র'গণ নানা দেশে যেতেন। সেনাপতি চোললক নিশ্চয় সে উদ্দেশ্যে বাহির হয়ে পরে রাজ্যলোভে ভাগ্যান্বেষী হয়ে পড়েন।

—সে যা-ই হোক, আজকেকার থাইদের অবাধ স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল চোললক শাসনকালে।

পশ্চিমের রাজধানী

লুপ্ত শ্বেতহস্তীর গরিমা

(শ্বেত-গোখরো—ট্যাক্সিক—ডাঃ রায়—এমারেল্ড বুদ্ধ—স্বামীজী)

—দশ ডলার দেব।

—তা হয় না, মিস্টার আমেরিকান্।

পথ-পাশে বিক্রেতার চীনা দোকান। চীনা মালিককে উদ্দেশ করে আমেরিকান্ পর্যটকের দর কষাকষি।

—যাও পনর ডলার দেব, এবার অমত করো না।

—বলছি যে হবার যো নেই স্যর্।

—কেন হবে না? কুড়ি ডলার দেব। এবার ত হয়েছে! দাও—

—না স্যর্, তুমি জানো না এদেশের আইন-কানুন। এমন শ্বেত সর্প, বিশেষ করে শ্বেত-কোব্রা (white cobra) রাজার ভোগ। আমি কি শেষে মরবার দেব কুড়ি ডলারের জন্য। খবর দিয়েছি, রাজার লোক এল বলে।

—চালাকী রাখো, আমি পঁচিশ ডলার দেব, তবু এটা হাতছাড়া হতে দেব না। চলবেনা তোমাকার।

—মুখ খারাপ করো না, পঁচিশ, কেন একশ' ডলার দিলেও পাবে না। ... পারে না। ... পাঁচ শ' ডলার।

—... থাকবে। পাঁচ শ' ...

আর ... নিয়ে, তারা ... দোকানদারকে বিল করে পাঠাতে ...

... মাইল গেলেই রাজধানী। ... হারিয়ে গেছে। বুকটা যেন খালি

খালি লাগে, অথচ শত চিন্তায়ও তো হারানো সে জিনিষটি যে কি, তার কোন সন্ধানই পাই না। এ যে বেয়াড়া রোগ।

আনমনেই চলেছি। তবে কি সত্যি মলয়-তান্ত্রিকের হিপ্‌নোটিজম্। না, না, না। সে হতে পারে না। জলজ্যান্ত মন্দিরটা বনমধ্যে, তা ছাড়া চারণ-ভিক্ষু তো রাজারামের রাজগী নিয়ে গান করে, একথা বিপুলই আমায় বলেছে। তার ওপর বুড়োর মুখে যা দার্শনিক তত্ত্ব, তা মলয়-তান্ত্রিক জানবে কি করে। হিপ্‌নোটিজম হবে কেন। বিপুলের চালবাজি। চারণ-ভিক্ষুর গান বুঝি তার পছন্দ নয়।

সকল চিন্তা ঝেড়ে ফেলে পথবন্ধুর শরণ লই। পাহাড় নাই ধারে পাশে অথচ চড়াই, ওঃ নদীর বাঁধ একটা। নৌকায় নদীর খেয়া পার হয়ে আবার উৎরাই। বাঁধের মাঝে খেয়াঘাটটা ঢালু করে কাটা, কষ্ট হল না। বাঁধটা কি উঁচু! নদীতে বান ডাকে নিশ্চয়। এদেশের নদী বেশির ভাগ চওড়ায় কম, কিন্তু খরস্রোতা।

বাঃ কলাবাগান! তবে কলাগাছগুলো বেঁটে। পল্লী দু' ধারে তক্‌তকে, আবার মাঝে মাঝে করোগেটের চাল, ঠিক যেন পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম একখানি। এখানে এন্তার পুকুর দেখা যাচ্ছে। মনটা টানে পল্লীছায়ায়। কিন্তু তা হবে না। পথ চলতে হবে, যেতে হবে এগিয়ে।

মনে হয়, এই যে পথটা গ্রামগুলোকে গেঁথে গেঁথে নিয়ে চলেছে শহরের সঙ্গে জুড়ে দিতে, এ যদি আধ-পথে থেমে যেতো, তা হলে দেশটাই হয়ে পড়তো খাপছাড়া, যোগাযোগের ধমনীই থাকতো অজানিত। তাইতো পথকে আমি শুধু অন্ধকারের আলো, আলোকের চেতনা-ই মনে করি না, মনে করি পথবন্ধুও একাধারে পথ ও পান্থ—একেবারে পান্থরাজ।

বিশ্বকবিও 'পথের গান' গেয়েছেন তাই—

'পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।
যাত্রাপথের আনন্দগান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।'

যার প্রাণে তোমার আহ্বান এলো, সে তো আর গৃহের আশ্রয়ে আবদ্ধ থাকে না, আকাশ হয় তার রাজছত্র, কঠিন মৃত্তিকা তার শয্যা, প্রলয়-গর্জন তাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যায়—তেপান্তরের মাঠে, যার নাই শেষ, নাই ঠিকানা।

একটা বড় নদী। আবার নৌকায় পার হতে হলো। সময় নষ্টই কেবল নয়, সে কি কম ঝামেলা! স্রোতের টানে ভাটিয়ে বেয়ে যে ঘাটে নামিয়ে দিল, সেখান থেকে পথের সেই মুখে আবার বেগ পেতে হলো মন্দ নয়। একটা ডানপিটে ছেলে তাদের বাড়ির তিন দিক ঘুরিয়ে পগার পার করে মিলিয়ে দিল পথ। বখশিস দিতে চাইলাম, সে নিল না।

এবার সঙ্গীরা বললো—শহর আর দূরে নয়।

ক্রোশটাক পথ যাবার পর পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে দেখছি শহরটার ধূ-ধূ মূর্ত্তি—শহর ঠিক নয়—প্যাগোডাগুলার চূড়া, সে যেন হাজার বছর আগেকার ভারতের বৌদ্ধধর্ম পরিবেশন।

একটু এগিয়ে গেলাম, শহর দূরে, নিরালা একটা দোকান-ঘর যেন, পিছনে তার ফার্ম হাউস, শূকর বাথান।

দু' চার জন অলস পথিক বুঝি সেখানে জটলা করছে। সম্মুখে যেতেই কানে এল—'দশ ডলার দেব'।…আমেরিকান সর্প-ক্রেতার দর কসাকসি।…

কিন্তু খেতাদের [illegible] ক্রোটিস করে রাজপুরুষেরা নিয়ে গেল দুধের মত শাদা গোখরো সাপটা, বাক্সের এক পাশের কাচের ঢাকনা দিয়ে দেখা গেল।

—এমন ধবধবে শাদা সাপ জীবনে দেখি নি!

কথাটা খেতাদের কানে গেল, সে এগিয়ে এসে শ্যামরাজ্যের আইনের মুণ্ডপাত করে বললে—প্রাণিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বলেন যে শাদা রংই স্বাভাবিক ও আদিম, তা মানুষের বেলা যেমন ঠিক, জীবজন্তুর বেলাও তেমনি। আবহাওয়া ও নানা কারণে মানুষ শাদা থেকে বাদামী, পীত, কালো কত রকম হয়েছে। সাপও তেমনি [illegible]। তাই আজও সাপের আদিম দেশ শ্যামে মাঝে মাঝে শাদা সাপ [illegible], শ্বেতহস্তী ছিল এদেশে, এখন নাই। এ সব সেখানেই [illegible]।

—কি রকম [illegible]?

—এক [illegible] লোকাচারের সম্বন্ধেই দেখলেন। রাজা কি না, সে খাবে শাদা সাপ। অন্য দেশে [illegible] কত গবেষণা হতে পারে, তাদের কত নাম হতে পারে, তা এরা বুঝে না। [illegible] এই ব্যাঙ্কক, যাইরা বলে এশিয়ার প্যারী এটা।

—কেন বলে, মিল কোথায় বলুন তো?

—তবে আর বলি কেন, প্যারীতে এফেল্ টাওয়ার একটাই আছে, ব্যাঙ্ককে আছে একশত প্যাগোদা। সে তো কথা নয়, প্যারী যেমন ইউরোপে ফ্যাশানের নেত্রী, তেমনি থাইরা মনে করে এশিয়ার নেতা হলো ব্যাঙ্কক, থাই-রাজধানী। মনে মনে ভাবটা এই যে, এশিয়ার সবাই, শুধু এশিয়া কেন বিশ্বের সবাই খুন-থাইদের অনুকরণ করুক। তাই এরা প্যারী, প্যারী করে কানে তালা ধরিয়ে দেয়।

—ধন্যবাদ মিষ্টার, আমরা পথশ্রমে কাতর, আস্তানা খুঁজতে হবে, বিদায়।

শহরে প্রবেশ করলাম। লজিং হাউস দেখে নেবো একটা। মীড় বল্লে—এটা চীনা পাড়া, এ পাড়ায় নয়, আর একটু এগিয়ে চলুন।

দুটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক এসে জুটলেন। মস্ত মস্ত একটা চীনা লজিং হাউস দেখিয়ে বল্লেন—এখানে চলুন, সব কিছু মিলবে, কোন ঝক্কি পোয়াতে হবে না।

মনে মনে ভাবি এরা লজিং হাউসের দালাল নাকি! সব বড় শহরেই তো থাকে।

মীড় তাকে ধমক দিয়ে বললে—আমাদের কোথা সুবিধা হবে তা নিয়ে আপনাদের মাথা ঘামাতে হবে না। আপনারা নিজের চরকায় যেয়ে তেল দিন বসে বসে।

ভদ্রলোক দুটি তবু সঙ্গ ছাড়ে না, বলে—আমাদের জাতভাই একটি আপনাদের সঙ্গে। বিদেশে তাঁর না কোন কষ্ট হয়, সেটা আমরা দেখবো বই কি। নইলে আমাদের কোন্ গরজ।

বিপুল বল্লে—গরজ যে আপনাদের কি, তা ওই চীনা লজিং হাউস দেখানোতেই ধরতে পারা গেছে। আর বেশি বুঝাতে এগিয়ে এলে এদেশে সুবিধে হবে না।

বিপুলের কথা শুনে ওরা বলতে বলতে চলে গেল—চল ভাই আপন কাজে, থাইগুলা সাপ-ব্যাঙ খেয়ে কাণ্ড-হারা, ওদের ভাল করতে গেলেও ফ্যাসাদ।

লোক দু'টা একটু দূরে চলে গেলে বিপুল বল্লে—এরা ইংরেজের স্পাই, চীনা লজিং হাউস ছাড়া আর কোথাও প্রবেশ করতে পারে না, তাই চীনা লজিং হাউসে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। আপনার পিছনে লেগে থাকবে হয় তো।

সে পাড়া ছাড়িয়ে আমরা যেয়ে উঠলাম থাই লজিং হাউসে। রুম একটা বেছে নিয়ে আমরা বিশ্রাম করছি। বিপুল গেল স্নানে। থাই-ম্যানেজার এসে আমায় বল্লে—পূবদেশের প্যারীতে এয়েছেন, কিছুদিন থাকবেন তো?

[illegible] — [illegible] এক মালের [illegible]।

—[illegible] জানাবেন। আবার দেখা হবে।

[illegible] এসে জানালে কোন্‌-এ কে ডাকছে। [illegible] তখুনি ফিরে এসে বল্লে—সেই স্পাই ছুটো।

তারপর আমরা বেরিয়ে পড়লাম। [illegible] চল্‌লো আমায় নিয়ে। রাস্তাগুলো ভাল, পরিষ্কার, [illegible] পেভ্‌ড। খানিক দূর যাবার পরই পেলাম পিচের রাস্তার পাশে [illegible]। [illegible] সব ঘরেই কাঠের মেঝে, তলায় ফাঁকা। পাকা বাড়ি খুবই কম।

একটা দোকানে দেখলাম গাঁজা ঝুলানো। কত লোক যাচ্ছে আসছে, কেউ তো তা কিনছে না। [illegible] করলাম—এদেশে বুঝি গাঁজা চল্‌তি নয়, কেউ কিনছে দেখলাম না।

—গাঁজা [illegible] বিদেশী ব্যবসাদাররা। আমরা খুব কমই খায়। চাষ করে বটে, তবে ঘৃণার চোখেই দেখে।

এমন সময় [illegible] একজন ভিক্ষু, পরনে গেরুয়া ধুতি, গায়ে গেরুয়া ফতুয়া ফিতে বাঁধা, পায়ে [illegible] ক্যানভাস জুতো, তাও গেরুয়া রং-এ ছোপানো। তাকে দেখেই [illegible] বল্‌লে—আপনি [illegible] বিশ্বাসকে এ পাড়াটা দেখান, আমাদের একটা [illegible] কাজ [illegible] সেরে আসি। বেড়ানো হলে বান-মুখরা থাই [illegible] হোটেলে পৌঁছে দেবেন। [illegible] বিশ্বাস। একটু দেরি হতে পারে।

ওরা চলে [illegible] দিকেই। আমি ভিক্ষুর সঙ্গে চল্‌লাম। ভিক্ষু বেশ [illegible]।

—[illegible] চাউল জমে বড় হচ্ছে, এর ঐশ্বর্য্য বাড়ছে আর [illegible] যাচ্ছে। আমি যদি কারু কাছে এগিয়ে যাই কিছু জিজ্ঞাসা [illegible] আমায় ভিখারী ভেবে বলে 'এখানে হবে না'। কেউ [illegible] কেউ বা প্রশ্ন শুনেও নিঃশব্দে চলে যায়। আগে এরকম ছিল না। এত [illegible] হলে তাদের দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হতে পারে না।

—[illegible] তা হলেও শ্বেতাঙ্গদের মত নৈতিক স্বেচ্ছাচার [illegible] নেই। [illegible] তো এদেশে বিলাসিনী নারী চোখে পড়ে নি। শুনেছি

[illegible] চীনা এ সব [illegible] [illegible] কারণ এদিকে বাইরের কদর আছে। কিন্তু [illegible] সেঁটে রাখে, এটা বড় লজ্জাকর।

—সেটাই আপনার নজরে পড়লো শুধু চীনা কাফে-কাবেরেতে যেতদের কুরুচিপূর্ণ বল্ ড্যান্স, প্যারীর অনুকরণে নগ্ন-নৃত্য, এসব বুঝি অশ্লীল নয়। থাইরা তা দেখে হাসে—ঘৃণার হাসি। যারা এ সকল পাশবিকতার ঊর্ধ্বে তাদের টেনে পঙ্কিল হাওয়ায় নামাবার চেষ্টা অবশ্য।

ফেরিওয়ালা সংবাদপত্র ফিরি করছে। বহু সরকার-দ্রোহী পত্রিকা রয়েছে, নির্বাধে বিক্রি হচ্ছে। পুলিশ কিছু বলে না। বলতে হলো আমায়।

—এই যে বিপ্লবী পত্রের প্রচার, সরকার তা বন্ধ করে না কেন?

—বন্ধ করলে তো সবই যাবে আণ্ডার গ্রাউণ্ড। তখন এদের সংবাদ রাখার জন্য গোপন দপ্তর খুলতে হবে, কত হাঙ্গামা হবে। তাতে উস্কানোই হবে। ওরা জানবে সরকার ভয় পেয়েছে, ওরা আরো বেশি করে হুটোপাটি করবে। তার চেয়ে সরকার এভাব দেখাচ্ছে যেন এদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। কাজেই সরকার আপত্তি করে না—যা খুশি লেখ, যা খুশি বলো, যা খুশি যৌন-চিত্র নিয়ে জটলা কর, এ সবেই তোমাদের শক্তি নিয়োজিত থাক্, তা হলে সরকার-দ্রোহী কাজে হাত দেবার ফুরসৎ মিলবে না। তাছাড়া এদেশে কোন রকমে ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ কারু মনঃপূত নয়।

—আচ্ছা, আর একটা কথা অনেক সময় আমার মনে হয়, থাই নারী স্বাধীন, কিন্তু এদেশের প্রবাসী এশিয়াটিক নারী, পুরুষের দাসী। থাই-নারী কেন ওদের চোখ ফুটায় না প্রচারদ্বারা?

—এখানে একটা বড় কথা পাড়তে হয়, সেটা দার্শনিক। সেটা হলো ভাব-সংযম। থাই-নারী ইচ্ছা করে সকল দেশের সকল নারী তাদের মত সর্ব্ব-স্বাধীন হোক, কিন্তু মুখ ফুটে সেকথা প্রচার করবে না। এটা প্রচারের জিনিষ নয়। প্রচারের ফলে যারা মত বদলাবে, তাদের চরিত্রে দৃঢ়তা নাই, তারা নতুন মতকে বেশি সময় ধরে রাখতে পারবে না, একটু চাপেই পুরাতন পথে চলে যাবে। তার চেয়ে থাই-নারীর স্বাধীনতা দেখে যদি অন্য নারীর প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে, তবে আপনি সে পথ বেছে নেবে অটল হয়ে।

—কিন্তু শ্বেতরা তো শুধু প্রচারের মুখেই তাদের সাম্রাজ্যবাদকে অপ্রতিহত রাখে।

[illegible] খোলা ব্যবহার, সুয়েজের দেশে [illegible] শত্রু-মিত্রকে [illegible] স্বার্থ। [illegible] পারবে না। তারপর [illegible] একটিও খাই পায় নাই শ্বেতরা। [illegible] যেমন অন্ত জাতের পিছনে [illegible] চায়, তেমন ভাবে অন্তজাতকেও থাইদের পেছনে লাগাতে সাহসী হবে। [illegible] কাপুরুষের কাজ করতে থাই রাজি নয়। তারপর প্রচারের প্রধান শত্রু হলো পাল্টা-প্রচার, আর যুক্তি-শক্তি যেদিন প্রবল হবে, সেদিন মূল প্রচার তলিয়ে যাবে, আর সাম্রাজ্যবাদের হবে পতন। যেমন সূত্রপাত দেখা যাচ্ছে আপনাদের ভারতে ইংরেজের প্রচারের বিরুদ্ধে।

সন্ধ্যা হলো। [illegible] হাউসে পৌঁছে দিয়ে গেল।" বিপুল ও মীত তখনো ফেরে নাই। গরম জলে পা মুছে, কাফি খেয়ে আর করি কি! থাইদের কথাই ভাবি। শিশুকাল থেকে শ্রমের কাজ ক'রে এরা পায় স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য, আর ফলেই [illegible] অপরিসীম মনের বল (Sound mind in a sound body)। এই মীত, একজন গ্রাজুয়েট হয়েও হীন পরিচারকের মত আমার সকল পরিচর্য্যা করছে, রান্না করছে দিনের পর দিন, আমাদের দেশের ক'জন গ্রাজুয়েট এ খাটুনি বরদাস্ত করতো?

এমন সময় এলেন প্রতিবেশী শ্যাম ভদ্রলোক। পান খেয়ে খেয়ে দু' কষে [illegible] কালো দাঁতগুলো বার করে পরিচয় দিলেন তিনি উকিল। [illegible] খুশি হলাম। কিন্তু তিনিও রাজধানীবাসী অপর সকলের মত [illegible] 'এশিয়াখণ্ডের প্যারী ব্যাঙ্কক'...

—ছিঃ [illegible] ওকথা বলতেন না। প্যারীর সাহিত্য-সৃষ্টি, প্যারীর উদার [illegible], প্যারীর ঐশ্বর্য্য কিছুই তো এখানে নেই। ভেনিস্ বা অ্যামস্টারডম্-এর [illegible] এইটুকু যে রাস্তার পাশে পাশে খাল, সে খালে নৌকা চলে। [illegible] বেনারসের সঙ্গে মিল এজন্ত যে ব্যাঙ্ককে [illegible] খানদান-মিনার-এর ছড়াছড়ি। তা না হলে ও-সব

শহরের একটা রাস্তায় যা ইট-পাথর, বেনারসের গঙ্গাতীরে যা শাণ-বাঁধানো ঘাট, ব্যাঙ্ককের সমগ্র অট্টালিকা-চূর্ণেও তার মাল-মশলার এক কোণ পূর্ণ হয় না। ইউরোপে প্যারীর যে [illegible] অর্জন করবে [illegible] রূপ দিয়ে প্রতিযোগার [illegible]

—সে চেষ্টা তো চলছে। তা [illegible] নামে মাত্র। তা হলেও প্যারীর সঙ্গে তুলনা এজন্যে যে বাহীর আধুনিকতায় বাইরো ফরাসী দেশ থেকে পশ্চাৎপদ নয়।

—সে কথা আমায় একজন আমেরিকানও বলেছে, বলেছে অবহেলার সঙ্গে। শ্বেতকায়রা তাই বিদ্রূপ করে আপনাদের।

এ সময় এল বিপুল আর মীড্। উকিল মশায় বিদায় নিয়ে গেলেন। রাতে আর রান্না করা হলো না। চীনা খাবারের দোকান থেকে খাবার কিনে আনা হলো। পিষ্টকও। খাওয়া শেষে শুয়ে শুয়ে মীড্ বল্লে—

—আজ দুটি বন্ধুকে জাহাজে তুলে দিয়ে এলাম।

—কোন্ দেশে যাবে?

—কোন্ দেশ অবধি যেতে পারবে বলতে পারি নে। কারণ তাদের পাসপোর্ট, তাদের সনাক্ত-করণের প্রতীক আমার জামার পকেটে। আর তারা সজ্ঞানে যায় নাই, গিয়েছে মাতালের বেহুদ্দ হয়ে চোখ বুজে।

—কেন শুধু শুধু এতগুলা মিছেকথা বলছো, আমি তো জানতে চাইনি কোথা গেছ্লে।

—মিছে কথা নয়। আরো মজা শুনুন, তারা মদ খেয়ে বেহুঁশ, থলের পুরে তা পিঠে করে বয়ে নিয়ে সাঁঝের সময় জেটি-কুলিদের ভিতর মিশে তাদের রেখে এলাম জাহাজের মালের গাদায়। টিকেটও কেনা হয় নি। তাদের পকেটে রেখেছি কাগজে লিখে—'মালিক-প্রার্থী গাধা'। বিশ্বাস হচ্ছে না আপনার?

বলেই মীড্ উঠে তার পকেট থেকে নিয়ে এল পাসপোর্ট দুখানা, দুটি পিতলের ব্রিটিশ ক্রাউন, পুলিশের টোকন্। বুঝলাম ব্রিটিশ স্পাই দুটাকে কি যেন করেছে।

—ওরা আপনার পিছনে লেগেছিল, তাই সংবাদদাতা সেজে ওদেরকে এক কাফেতে নিয়ে মাদক খাইয়ে বেঁহুশ করে অষ্ট্রেলিয়াগামী জাহাজে তুলে দিয়েছি

[illegible] ফিরে [illegible]

[illegible] কিছু করবো না বলেই [illegible]

[illegible] বেচারাদের নেশা ছুটবে, আর [illegible] ভিতর জাহাজে, তখন কি রগড়ই না হবে। [illegible] না পাসপোর্ট, টোকন্।

এদের অসাধ্য কিছু নাই। তাই জিজ্ঞেস করি—

—আমায় [illegible] জাহাজে তুলে দেবে ?

—তার দরকার হবে না। আপনি ভুকেজো, একটু রক্ত দেখেই মূর্চ্ছা যান। আপনাকে দিয়ে কোন কাজের কাজ হবে না। সিঙ্গাপুর ভুল করেছে বলে আমরা [illegible], সে ভুল করবো না।

দু'দিন বিশ্রাম নিলাম। কোথাও বেরোই নাই। কারণ সঙ্গী দুটি আমার সঙ্গ ছাড়ে নাই। একটু বিরক্ত বোধ করছিলাম। তৃতীয় দিন প্রাতে দেখি বিপুল ও মীজ যাত্রার জন্য তৈরি, আমার কাছে বিদায় চাইলো।

—মিঃ বিনায়, আজ আমরা বিদায় নিচ্ছি। আপনার সঙ্গে থেকে আর কোন সাহায্য করা সম্ভব হবে না। ঢের কাজ হাতে।

মীজ্ [illegible] কোলাকুলি করলো—ইন্দোচীন সীমান্তে দেখা হতে পারে ন্যাই, নমস্কার্।

তারা [illegible] না করে লজিং হাউস ছেড়ে সাইকেলে গিয়ে চাপলো, আমি যে [illegible] উচ্চারণ করবো, সে অবকাশও আমায় দিল না। এরা এমনি [illegible] তাদের কাছে বড়, কথাটা নয়।

সঙ্গী [illegible] ছেড়ে [illegible]। নৌকাপথে সভায় যোগদানের পর এদের সঙ্গ একটু [illegible] আরামে আমেজে চল্‌তে-বল্‌তে পারি নাই।

লজিং হাউসের [illegible] আপনার রুম পরিবর্তন করা হবে। রুমটা [illegible] আসবে, আপনাকে স্থান দেওয়া হবে একেবারে [illegible]। একটি কথা মনে রাখবেন, যখনই বেরোবেন [illegible] কোথা যাচ্ছেন।

[illegible]

—এক [illegible]

গাইড এসে আপনাকে নিয়ে যাবে [illegible] থাকবে। হাঁ, আর একটা কথা, নতুন [illegible] টিকেল মানে। আজকের দিন অবধি [illegible] গেছে; থাই-ছোকরা ছুটি। ভাড়াটা আগাম দিতে হয়।

দিয়ে দিলাম দশ টিকেল, তার পর গেলাম কাফি-দোকানে। বেশিক্ষণ বস্তে হলো না, চীনা-তরুণ একটি এসে আমায় ডেকে নিল। দুজনে সাইকেলে বেরোলাম রাস্তায়।

তরুণটি আগে, তার সাইকেল জোর, মনে তার ব্যস্ততা, আমি পশ্চাতে সব কিছু দেখে-শুনে মনটাকে সতেজ করে চলেছি। চীনা পাড়ায় আর সাইকেল দেখতে পেলাম না। লোকগুলা রিক্সায় চেপে আনাগোনা করছে। থাই-পল্লীতে রাস্তায় কেবল সাইকেল, মেয়েরাও সাইকেলে চলেছে অনেক রাস্তায়। সাইকেল-রিক্সাও মাঝে মাঝে রয়েছে। শ্যামদেশেই সর্ব্বপ্রথম আমি সাইকেল-রিক্সায় চেপেছি।

একটা গলিপথ—দুধারে সারি সারি কাঠের বাড়ি। একতলা, দোতলা, তেতলা। এখানে বাস করে চীনারা। নগ্ন-গাত্র চীনা ছেলেমেয়ে পথে পথে লোহার চাকা ঠেঙ্গিয়ে নিয়ে চলেছে—সাইকেলের অভাবটা পূরণ করছে যেন ঘুরন্ত চাকার পিছনে ছুটে ছুটে। দু-একটি বৃদ্ধা-প্রৌঢ়া-যুবতী বাজার করে চীনা মূলা, শুঁটকি মাছ নিয়ে ফিরছে, সে শুকনো মাছের গন্ধে পাড়া ছয়লাপ।

দেখতে দেখতে একটা খালের ধারে এসে পৌঁছলাম। গাইড-তরুণকে দেখি না। কোথা গেল? চারদিকে তাকাই। হঠাৎ নজর পড়লো খালের সেতুটির ওপর, সেখানে সে অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। আমি লক্ষ্য করছিলাম খালের চলন্ত নৌকাগুলাকে, তাই তরুণটির চলে যাবার পথে চোখ বুলাতে পারি নাই।

নৌকাগুলা এদেশে শুধু আরোহীই বয়ে নেয় না, ফেরিওয়ালার কাজও করে। কয়েকখানি নৌকায় ছইয়ের নীচে-বাইরে থরে থরে ফল-পাকুড় সাজানো, কোনটায় শাক-সবজি, তারা ঘাটে ঘাটে লাগিয়ে ক্রেতাদের চাহিদা মিটাচ্ছে। পণ্যের প্রশস্তিতে চীৎকারও করছে কম নয়। বাতাবী লেবু কেনবার ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু বয়ে নেবার ঝামেলা করতে মন সায় দিল না।

[illegible] বাস করে।

[illegible] ইতেজা দখকে দাস-[illegible] কৌতূহল হলো। কিন্তু গাইড সেখানে [illegible] একটা বিদ্যালয়ে। শিক্ষক মশায় সেখানেই থাকেন, [illegible] ভাষা শেখান। শিক্ষকের বাসগৃহের এক কক্ষে আমরা [illegible]।

শিক্ষক [illegible] আমার ভাই, গৌরীশ যাকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন [illegible] সিঙ্গাপুর দেখবার জন্যে। ('মলয়েশিয়া ভ্রমণ' দেখুন)।

—কি [illegible] খবর কি?

—[illegible]?

—হাঁ, [illegible] জানতে চাইছি।

—খবর ভাল, [illegible] ভিতর যতটুকু ভাল থাকা সম্ভব।

—[illegible]?

—[illegible] কোন লাভ নেই। যোগাযোগ হতে পারে আরো পূর্বাঞ্চলে। যাক, [illegible] থাকবেন?

—[illegible]

—[illegible] কম পেয়েছেন সত্যায়, বাকি [illegible] যাওয়া-আসবো। থাই-দল আপনাকে [illegible] হবে না আপনাদের। আপনাকে নিয়ে [illegible] ইন্দোচীনে, চীনে। ও-দুটি দেশেই [illegible] সেখানে আমরা গোপনে [illegible] ঐতিহ্যবাহের জার। [illegible] পাবেন না, [illegible] বেড়াতে হবে। মুখে মুখে [illegible]।

এমন সময় [illegible]
মনে করলাম [illegible]

—গুড্ মর্নিং মিঃ [illegible]

সেই একেবারে সিঙ্গাপুরের [illegible] মনে আনতে পারছি না। ব্রাদার লাই ভিতরের ইন্ট্রডিউস করে দিল— মিঃ বিশ্বাস, মিঃ গ্রে হর্স।

গ্রে-হর্স! হাঁ হাঁ, নামটা তো খুবই পরিচিত। কিন্তু মূর্তি তো সম্পূর্ণ অপরিচিত।

—মিঃ বিশ্বাস, আমি সিঙ্গাপুরে আপনাকে দেখেছি, আপনি আমায় লক্ষ্য করেন নি হয়তো। আপনার সম্মানিত অতিথি কোন কিছু উপহার দিয়েছে?

—ওঃ, বুঝেছি! ইয়েস্, আপনার জন্যই তো শেষ কোড্। আমার সাইকেলটার পিছনের মাড-গার্ড খুলুন, সাইকেল-বাক্সে রেক্ আছে।

খোলা হলো মাড-গার্ড। ভিতরের আইভরি চিরুণী বার করে গ্রে-হর্স্‌কে দিলাম। বুকটা হালকা হলো, বিদায় নিলাম তখনই। হিন্দুস্থান রিপাব্লিক্যান এসোসিয়েশনকে নমস্কার।

ব্রাদার লাই খেয়ে যেতে বল্‌লো, রাজি হলাম না।

লজিং হাউসে ফিরে এসে দেখি, দোতলার মস্ত বড় একটা হলঘরে আমার স্থান হয়েছে। দুপাশে দুটি খাটে ধব্‌ধবে বিছানা। মাঝখানে একটা টেবিল, তাকে ঘিরে চেয়ার আট দশখানা। খাটের শেষে জানালার ধারে ইজিচেয়ার। মনটা খুশিতে ভরে গেল, কিন্তু ব্রাদার লাই-য়ের দল দিয়েছে ভাড়ার টাকা, সে কথাটা ভুলতে চেষ্টা করি।

বিকেল বেলা নিজে নিজেই বেরোলাম। বেজায় হাল্‌কা লাগ্‌ছে প্রাণটা। সঙ্গী মানুষের দরকার হয়, কিন্তু যে সঙ্গী 'পিলরী' ফাঁসির মত কণ্ঠরোধ করে কণ্ঠলগ্ন থাকে, সে সঙ্গী চির-অবাঞ্ছিত। তাই সঙ্গীর দরদ থেকে মুক্তি, কোড সংবাদ বহনের ঝক্কি থেকে নিস্তার—সাতই আমায় সকল দায়িত্বের পরপারে পৌঁছে দিয়েছে। আমায় আর পায় কে! একা একা চল্‌তে ভারী ভাল লাগলো।

সংবাদপত্র অফিসগুলো ঘুর্‌লাম। তারা আগ্রহ সহকারেই রিপোর্ট লিখে নিল। ফিরতি পথে দেখলাম একটা ট্রাম ডিপো। কর্মচারী সকলেই অবৈত,

[illegible] করে [illegible]

[illegible] সংক্ষিপ্ত বিবরণ। [illegible] দেখা করতে এলেন একজন [illegible] চললো, পোষাক-আষাকে তিনি [illegible]।

—[illegible] আপনার মনের কোণের লুকানো [illegible] টেনে নিয়ে গেল। কেমন করে কোন্ [illegible] থাকে না। আমরা যখন মক্কা-মদিনার কেচ্ছা [illegible] ইসলাম যেন পেয়ে বসে। অথচ আমাদের জন্মভূমি [illegible], এদেশের খেয়ে-পরে মানুষ আমরা, এদেশ ছেড়ে অন্যত্র যাবার কোন সম্ভাবনা নেই, তবু আরবের মরুরাজ্য মায়া বিস্তার ক'রে মগজ [illegible]। এ যে বিষম দায়। কিন্তু এ দোটানাকে দমন করতেই হবে। আপনিও করুন, তা হলেই [illegible] মিলন-সেতু রচিত হবে।

সেদিন আর বেশি কথা হলো না। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে আসবেন [illegible]।

তারপর [illegible] আমি তো তাঁর চেহারা আর জীর্ণ পোষাক দেখে থ' মেরে গেলাম। [illegible] চাউনে তাঁর বাড়িতে এক সময়ে গছিলাম। একটা [illegible] কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট ছিলেন তিনি, বিভব-প্রভাব [illegible] একেবারে সর্বহারা। তামিল হয়েও যেমন বাংলা [illegible]।

[illegible] ভেবে কিছু খাবো বলে এসেছি।

—[illegible]

—[illegible]। কতদিন যে পেট ভরে খেতে পাইনি [illegible] পেট ভরে খেলে আর বাঁচবো না।

[illegible] জামা, শক্তালি দেওয়া জুতা [illegible] লোকে পেশাদার ভিখারী মনে করতো। [illegible] জানিয়ে দেয় তাঁর হারিয়ে যাওয়া [illegible] ব্যথার ব্যথী হয়।

মেনাক্সায় থেকে মিঃ আদি ঘুম দিলেন। [illegible]
ছিল না। ক'দিন উপোসের পর খেলেন [illegible]

ঘুম থেকে উঠলে মিঃ আদিকে দিলাম সিগারেট। ধূমপান করতে করতে বললেন—কি দুর্গতি হয়েছিল, পেনাং থেকে গ্রেপ্তার হইগন। পড়লাম গিয়ে বিদ্রোহীদের মাঝে। একটা ব্যাপারে ফরাসী সরকার দিল দুবছর জেল। বেরিয়ে এসে পেনাং গিয়ে দেখি আমার যা-কিছু ছিল সবই ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সও। তাই এসেছি শ্যামদেশে। কিন্তু শ্বেতদের জুলুম, ইংরেজ-ফরাসী মিলিত গোয়েন্দা আমায় প্রাণ ছাড়তে দিচ্ছে না। তাদের হিতৈষী-বন্ধু রাজা প্রজাধিপকের সেরেস্তায়ও চুকলি কেটে আমার দিচ্ছে না কোন রকম কাজ-কারবার করতে। অথচ বাস্তুত্যাগী বলে যে খয়রাত করবে, তাতেও বাধা দিচ্ছে শ্বেতেরা। এখন কোন উপায় করে দিতে পারেন ?

—বড় শক্ত প্রশ্ন মিঃ আদি। আমি কিছু করতে গেলে আমায়ও ফাঁসাতে চেষ্টা করবে, জানেন তো সিঙ্গাপুর পুলিশ চাকরি থেকে তাড়িয়েছে বিপ্লবীদের আশ্রয়-দানের অপরাধে। তবু হতাশ হবেন না, দেখি কিছু করা যায় কি না।

—দেখুন একবার চেষ্টা করে। আপনার যে বিপদ হতে পারে তাও বুঝি। শ্যামদেশে ফরাসী ষড়যন্ত্র আর গ্রীক পর্য্যটক ফলকানের উচ্ছেদের পর থেকে থাইরা কোন ভ্রমণকারীকে সুনজরে দেখে না। আপনি কি করে ব্যাঙ্কক পৌছতে পারলেন তা বুঝিনে।

—পারলাম আমার বাঙ্গালী বন্ধু একজন যোগাড় করে দিয়েছিল দুটি থাই-সঙ্গী। নইলে অনাহারে মরতে হতো।

সে দিনই ব্রিটিশ কনসালের সঙ্গে দেখা করে মিঃ আদি'র ওপরকার ব্যান্ (নিষেধ বিধি) তুলে নিতে অনুরোধ জানালাম। প্রথমটায় সাহেব রাজি হয় নাই। কিন্তু তখন বুঝিয়ে বললাম, যে একবার পাকে-চক্রে বিদ্রোহীর দলে গেছে, পরে যদি লোকটার মত বদলায়, তবে তাকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া উচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমার নিজের কথা তুললাম। সাহেব কথা দিল চেষ্টা করবে, তবে আগে খোঁজ করবে সত্যি সে বিদ্রোহীদের আওতা ছেড়েছে কি না।

চেষ্টা করবো বলেছিলাম, যা হোক চেষ্টা করলাম, এখন ফলাফল কি হবে জানি না।

[illegible] আমাও কি আমাদের [illegible]

[illegible] বলা বা ইন্দোচীনে [illegible] যোগাযোগ-সমর্থন [illegible] ঠিক আমাদের দল, [illegible] আমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজ করে না।

—[illegible]। আমার ভয় হয়েছিল ওদের হঠাৎ-বিদায়ে।

—ভয় নেই. সে নির্দেশ সিঙ্গাপুরের। আমরাই এবার আপনাকে সাহায্য করবো বলে।

মনে মনে ভাবি [illegible] বড় সুখের কথা নয়। ভাবছি বটে, কৈফিয়ৎ তৈরি রেখেছি।

—কি ভাবছেন [illegible]?

—ভাবনা রয়েছে এখন কি করে ইন্দোচীনে যাবো। প্রথমতঃ ভিসা, তারপর চাই টাকা।

—সে যুক্তি [illegible] বলেই তো আমরা এগিয়ে এসেছি। পরশু সন্ধ্যায় আনবো, [illegible] লাগতে পারে।

—বেশ, [illegible]। [illegible] 'কেপা' (বিপ্লবী) আনবেন না।

—আপনি [illegible] বুঝবেন না। রাজারা বড় বেয়াড়া, সব রকমে দেশকে ডুবাচ্ছে। [illegible] হয়েছে ইউরোপীয়দের। থাইরা চায় না বিদেশী [illegible] কিন্তু আহাম্মোক রাজা নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারছে। [illegible] তো সবাই-এ এদেশবাসী। তার পর ধরুন, আপনার [illegible] বিরুদ্ধে, তা বলে জাপানেরও কু-মতলব কম নয় [illegible] করে চলতে হয় এদের। তাই বিদেশী মাত্রেই [illegible]

[illegible] কোর্ট, [illegible] অফিস, হোম-ডিপার্টমেন্ট—[illegible] প্রতিশ্রুতি কথাবার্তা বিপ্লব-বিরোধী। [illegible] পক্ষপাতী নয়, যাতে শাসন-যন্ত্র

[illegible]

[illegible]
বন্ধুদের [illegible]

সেদিন দেখা হলো [illegible] মধ্যে। [illegible] যখন আমি টিন খনিতে কিছুদিন কাজ করি, সে সময় মিঃ হাল ছিলেন আমার ওপরওয়ালা মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। সেই মিঃ হাল আমায় দেখেই ডাকলেন। মূর্তি দেখে আমি চোখকে বিশ্বাস করতে পারি না।

হুবহু মিঃ হাল, অথচ পরণে লুঙ্গি, পায়ে চটি, গায়ে মলয় কামিজ। সাহেবের বয়স হয়েছে এখন, চুলে পাক ধরেছে। মোটর থামিয়ে নেমে এসে সমুখে দাঁড়ালেন।

—মিঃ বিশ্বাস, সংবাদপত্রে আপনার নাম ও চিত্র দেখে তাক্ লেগে গেছলো, এখন আমায় দেখে নিশ্চয়ই আপনি মনে করছেন আমার মাথা খারাপ হয়েছে, না?

—না, তা কেন! এ গরমের দেশে আপনার নতুন পোষাক আরামপ্রদ।

—ঠিক বলেছেন। এ পোষাকে এদেশে বাস করে অনুভব করছি আরো পঞ্চাশ বছর পরমায়ু আমার বেড়ে যাবে। আরো অবাক হবেন শুনে যে আমি বিবাহ করেছি একটি থাই-নারী। কয়েকটি ছেলেমেয়ে আমাদের। হাঃ হাঃ হাঃ।

—আপনার রকম দেখে মনে হয়, আপনি জীবনে পরম সুখী, আর শ্বেতদের এটিকেটের ডুরি কেটে বন্ধনহীন হয়ে খুন-থাই বনে গেছেন।

—চলুন স্যর আপনার লজিং হাউসে।

লজিং হাউসের দোতলায় ঘরে এসে গরম বোধ হলো। সমুদ্রের দিকের জানালা খুলে দিলাম, হু-হু শব্দে সাগর-বায়ু বড় বইয়ে দিল ঘরে। বিজলী-পাখা নাই সেজন্য ত্রুটি স্বীকার করলাম।

—তাতে কি! থাইদের বাড়িতে বিজলী-পাখা থাকে না, ভগবানের দান মুক্ত হাওয়া তো অমৃত-মদিরা। আমাদের বদভ্যাস, তাই কৃত্রিম বায়ু খুঁজে বেড়াই।

বুঝলাম সাহেব শুধু পোষাকে নয়, এশিয়াটিকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতেও অধিকারী হয়েছেন। মিঃ হাল তাঁর ড্রাইভারকে ডেকে খাবার আনালেন। দু'জনে মিলে তা খেলাম। ডাল ভাত মাছ মাংস, খাওয়া শেষে লেবুরস মিলিয়ে এক গ্লাস করে ঠাণ্ডা জল খাওয়া হলো।

[illegible] স্বাতন্ত্র্য [illegible] প্রণয়ে [illegible]

—[illegible] লাগবে গণ-বিদ্রোহ [illegible] জিজ্ঞাসা করছি, আর কিছু আমি চাই [illegible] দিয়ো না।

—[illegible] সবার মুখেই শুনছি বিপ্লবের কথা। পথে দেখেও এলাম [illegible]। পুলিশ উদাসীন কেন?

—এ দেশের পুলিশ [illegible]। এদেশের নেতারা সোভিয়েট রুশের দিকে চেয়ে আছে, কিন্তু জনসাধারণ তার দিকে চেয়ে থাকে না, চিরাচরিত ধারাকে আঁকড়ে আছে। কাজেই প্রচারপত্র তাদের কাছে অর্থহীন খোশগল্প, তারা তা দিয়ে ঠোঙা তৈরি করে। তাতে পুলিশ করে আরো কারসাজি, কৃত্রিম প্রচার-পত্র বিলি করে, আবার তা উচ্চস্বরে [illegible]। সে প্রচারের নমুনা—'আমরা চীন হতে আগত, চীন তারা শিবকে [illegible] হোক!' 'আমরা ভারত হতে আগত, মঠে মন্ত্র পড়ে বিহারের [illegible] হোক!' এ-দুটো জিনিষকেই থাইরা করে ঘৃণা। কাজেই পুলিশের [illegible] থাইরা সকল প্রচার-পত্রকেই না পড়ে বর্জ্জন করে।

—এ ভাবে পুলিশ [illegible] দৃষ্টি অন্য দিকে আকৃষ্ট রাখতে চায়। তবু তো বিপ্লবের [illegible]।

—[illegible] সব রকমে তারা স্বাধীন, আমার বড্ড ভাল লাগে।

[illegible] আর একদিন [illegible] বলে। আমি বিশ্রাম করে [illegible] ব্যবসায়-অট্টালিকা তৈরি হচ্ছে কয়েকটা [illegible]। গুনে দেখলাম ছ'তলা হয়েছে, আরো [illegible]। যেন থাইদের সর্ব্ব-স্বাধীনতার সঙ্গে পাল্লা [illegible]।

ফিরে এসে [illegible] দিয়েছি। তখনই এলেন রাদার লাই, বাঙালী [illegible] আরো [illegible] ভদ্রলোক। তাঁদের ভিতর কোরিয়ান, ইঙ্গ-চীনা [illegible] সৌম্য মূর্তি, চেহারায় চীনা, কিন্তু

[illegible]

তিনি [illegible] দেবেন।

—শত-শতাব্দীর বিরক্তির ঘরে কোন দিন সত্য বাধা স্বীকার হয় না। অজ্ঞাত-অখ্যাত দীর্ঘকাল থেকেও বর্ষার নির্ঝরের মত শৈল বিদারিত করে পরিপূর্ণ বলে সে জেগে ওঠে, ক্ষুদ্র একক হয়েও সমগ্র অচলের হৃদয়াসন আচ্ছন্ন করে। ভারতের অবদানে সর্ব্বথা স্বাধীন শ্যাম গাঢ়তম তমিস্রা ভেদ করে পূর্ব্ব-এশিয়ায় অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নিয়ে চলে এসেছে, পৃথিবীর অঙ্গনদ্বারে ভারতের আনন্দ-গীতি নবস্থরে ঝঙ্কার তুলছে।

"শ্যামের 'শখিয়া' (সিংকোরা), শ্যামের 'অযোধ্যা,' শ্যামের 'কাঞ্চনাবুরী' (কাঞ্চনপুরী), শ্যামের 'অরণ্য প্রদেট্,' শ্যামের 'মঙ্গল বোরী,' ইন্দোচীনের শ্রীস্বপন, ওঙ্কারবট (যা একদিন শ্যাম এলাকা ছিল)—একটি রশ্মিই প্রসারিত করে প্রাচী-দিগন্তে—তা হলো 'চিং'-রূপ অর্থাৎ আমি স্বাধীন এবং বিশ্বমানব আমার অধীন, ভারতীয় সংস্কৃতির উদার ভাবনা, যে ভাণ্ডার সঞ্চিত হয়ে গেছে মানব সভ্যতার যৌথ সমবায়ে, কাল তার এক কণাও বিলুপ্ত করতে পারে নি, পারবে না।

"তারই সন্ধান পেয়ে বন্ধন-পীড়ন-দুঃখ-অসম্মান মাঝেও মৃত্যুঞ্জয়ের গম্ভীর নির্ভয় বাণী প্রচার করে বাঙ্গালী দিয়েছে নবভারতের আত্মাকে বন্ধনহীন সত্তা আর আজ চেয়ে আছে তারা একদৃষ্টে অনাদিকালের পুনর্ম্মিলিত সভাতল-পানে পরিধানের গৈরিকেরে খুলে ধ্বজা-রূপে উড়িয়ে যেখানে কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে এক হয়ে যাবে ধর্ম্মহীন অখিল-আমিত্ব মহোৎসবে।"

—ত্রংস্কাইৎ, ত্রংস্কাইৎ······(Trotskite)

পিছন হতে চীৎকার উঠলো। চেয়ে দেখি বিপুল আর মীত্। ওরা কখন এলো লক্ষ্য করি নাই। তাদের সঙ্গে রয়েছে মিঃ গ্রে হর্স।

'ত্রংস্কাইৎ' কি আমার জানা নাই, 'কমিউনিষ্ট' তখন আমি নামেই শুনে এসেছি, কিন্তু কি উপাদানে তারা গঠিত, আমার অজানা। তবু সে কথা প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করে নিজেকে বোকা বানাতে অভিলাষ ছিল না। অবাক্ হয়ে দেখি মুসলিম ভাই দুটি বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে আছে ডাঃ রায়ের দিকে। কি যেন নতুন দৃষ্টি তাদেরে ধরা দেয়-দেয়।

আমার দৃষ্টি আবার ডাঃ রায়ের বাক্যে তাঁর দিকে গেল।

—এ আমার বাক্য নয়, আপ্ত বাক্য। শাশ্বত। যাক্ এখন যে কথা জানাতে আমি আদিষ্ট। দেখুন মিঃ বিশ্বাস, আপনার জন্ত চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থা হবে। মুসলিম ভায়েরা আপনাকে নিয়ে যাবে ভারতীয় কনট্রাকটর একটির কাছে। মিঃ এ্যেন্‌ড্রুজ নিয়ে যাবে ইহুদী বণিক দুটির কাছে। কোরিয়ান আর চীনা ভাইয়েরা নিজেরা চাঁদা তুলে দেবে ব্রাদার্ লাই ভার নিয়েছেন। আর মিঃ হাল তো জেনেছি আপনার পূর্ব্ব-বন্ধু, তাঁর কাছে আপনি অযাচিতেই পাবেন সাহায্য।

—ধন্যবাদ ডাঃ রায়, আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

—কুণ্ঠা-বোধ করবেন না। কর্ত্তব্য, আমাদের ও আপনার মুখোমুখি। একটা কথা না বললে ব্রাদার্ বিপুল অসন্তুষ্ট হবেন। 'ব্রংক্কাইং' অতি ক্ষুদ্র কথা, তার চেয়েও ক্ষুদ্র—বা ক্ষুদ্রতর, বা বিন্দু-সম সত্য, যেখানে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি নেই, নেই সাম্প্রদায়িকতার স্বার্থ, সেই দেশ-কাল-পাত্রের অতীত সত্যই আমাদের লক্ষ্য। মার্ক সুয়ার তার বৈদিযুক্ত বাক্য। শান্তি, শান্তি, শান্তি।

চুপ হয়ে সবাই বিদায় নিলেন, নমস্কার আর নমস্কান্ উচ্চারণ করে। ব্রংক্কাইং, মার্কসবাদ—এ সব হেঁয়ালির মধ্যে আমি আপন রং হারিয়ে ফেললাম। ডাঃ রায়ের কথা—'এ আমার বাক্য নয়', 'আমি আদিষ্ট'—এতে তো মনে হ'ল তাঁর স্বাধীন সত্তা নাই, কোনো ব্যক্তি বা দল-বিশেষের চালিত।

পরদিন থেকে চাঁদা সংগ্রহে ঘুরতে লাগলাম। কিছু টাকা হাতে আসবার পর পাসপোর্টের কথা মনে পড়লো। মিশ্র পাসপোর্ট ইমিগ্রেশন অফিসে দেখানো হয় নাই। পাসপোর্ট নিয়ে গেলাম অফিসে। পরোখ করে তারা জেরা করলে [illegible] আপনার?

—[illegible] প্রতিপালিত, ভারতে নয়, তাই দেখতে এসেছি।

তারা [illegible] যে [illegible], বললে—এ দেশে সুবিধা হবে না, [illegible] যান।

—তাই [illegible] ফকির কোথায়?

[illegible] তারা [illegible]। [illegible] আর তাদের ঘাঁটাঘাঁটি করি নাই [illegible] সে সুবিধা হবে না [illegible]।

মাঝে মাঝে পথ হারাতাম, তখন পথ চলতে আরামই লাগতো। সেদিন ভিসা পেয়েছি ইন্দো-চীনের। সেখানেও কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে ঢের। তবে চীনে যাবো শুনে লোকগুলা খুশি হয়েছে, বলেছে ইন্দো-চীনে দেখার কিছু নাই, তবে ভারতীয় বেনিয়ার সাক্ষাৎ নাকি মিলবে। কথায় তাদের কি রকম বিদ্রূপের রেশ। যাক্ গে, তা নিয়ে মাথা ঘামাই নাই।

লজিং হাউসে ফিরে দেখি মিঃ হাল বসে আছেন।

—চলুন মিঃ বিশ্বাস আমার বাড়ি মহাভোজের ব্যবস্থা। আমার স্ত্রীর পূর্ব্ব স্বামীর ভাইয়ের ছেলে বিয়ে করে আমাদের ওখানে আজই এসেছে। শ্যামদেশের নিয়মে সে-ই হলো আমাদের যথাসর্ব্বস্বের মালিক। প্রথম বিবাহের সন্তানই হয় উত্তরাধিকারী, পূর্ব্ব-স্বামী নিঃসন্তান, তাই ভাইয়ের ছেলে মালিক।

—আপনার ছেলেমেয়েরা তা হলে পাবে না কিছু ?

—আমি সে ব্যবস্থা করবো, নইলে আমাদের মৃত্যুর পর যা থাকবে তার এক পয়সাও আমার ছেলেমেয়ে পাবে না।

মিঃ হালের বাড়ি খালের ধারে, চারদিকে ফুলের বাগান, মাঝখানে ছবির মত বাড়িখানি। সব রং-করা ভিতর বাহির। তাতে সূর্য্য-কিরণ পড়লে চাওয়া যায় না। এমনি ধব্‌ধবে শাদা। ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম একটি বিন্দুর মত দাগও কোথা নাই। মোটর হতে দ্রুত ক্ষেত্র-তৎপরতায় নেমে মিঃ হাল পোষাক বদল করে শ্যাম ধুতি আর কামিজ পরে ফিরে এসে আমায় অভ্যর্থনা করলেন—স্বাগতম্, আজ আমি কৃতার্থ!

ইউরোপিয়ান্ একজনের কাছে এরূপ রাজযোগ্য সম্মান পাবো, এ যে স্বপ্নের অতীত। যে সাহেব ছিলেন একদিন আমার প্রভু, স্যর্ ছাড়া যাকে কখনো সম্বোধন করতে সাহসী হই নাই, সে-সাহেব আমার মত একটি ভারতীয় কালা আদ্‌মিকে সম্মানিত অতিথির পূজ্য আসন অকাতরে দিচ্ছেন! সাম্যের দৃষ্টি এলে বুঝি স্বাধীন শ্বেতকায় সৌজন্যে সারা বিশ্বের সেরা মানব হয়ে যায়।

বর-কনে দেখলাম অবাধে রঙ্গরস করছে, আর আমাদের দেশের নবপরিণীত! তাক্ লেগে গেল এদের কুণ্ঠাহীনতায়।

—বিয়ে হয়েছে কবে মিঃ হাল ?

—কবে আবার কি, এদের কি বিয়ে আছে! ছুটিয়ে দিলো বাড়ি ছাড়লো, ব্যস্। ক'দিন বাদে ফিরে এলে কেউ আর জিজ্ঞেসও করবে না, বিয়ে হয়েছে কি

না। এদেশের রীতি, দুজনের মিলনই বিয়ে। বিয়ের পর বাপের বাড়ি উঠতে হয়। তাই এসেছে এখানে। তবে থাকবে না এখানে। ঘর ভাড়া করা হয়েছে, কালই সেখানে যাবে। শ্যামদেশের নিয়ম। কনের বাপ ধনী, সে দিয়েছে এক শত আউন্স সোনা। আমি দেব হাজার টিকেল।

নিমন্ত্রিত ইউরোপীয় ছিল চার জন। সেখানে গিয়ে বসতেই ছোট ছোট গ্লাসে মদ [illegible] পান [illegible] পানীয়। তার পর লাঞ্চ। [illegible] স্পর্শ [illegible] আমার [illegible] ওদের [illegible]

[illegible] এলেন বরের বাপ, [illegible] গ্লাস গ্লাস পান চললো। তার পর বরের [illegible] নিয়ে সাগর-তীরে গেলেন —মোটরের [illegible] হলো। সাগরের হাওয়ায় সাহেবের চোখ বুজে এলো। আমি [illegible] বসে পড়লাম।

কিন্তু [illegible]। জোয়ারের জল এসে রাস্তা অবধি পৌঁছালো। আমি পোষাক [illegible] ঝাঁপিয়ে পড়লাম জলে। অনেকক্ষণ [illegible] উঠবো ভাবছি, মিঃ হাগ জেগে উঠে এলেন জলে। আরো [illegible] ফিরে এলাম। তখন সন্ধ্যা। বিরাট খানা। [illegible] ঘুম [illegible]। মোটর গাড়িতে আমায় পৌঁছে দিলেন সাহেব।

আবার [illegible] মিঃ [illegible] সঙ্গী। ইহুদীরা দিল একশত ডলার। [illegible] একটু পরেই এলেন ডাঃ রায়, ব্রাদার্ লাই আর মুসলিম [illegible] ভারতীয় বলে গ্রহণ করতে পারি না, তাঁর চীনা [illegible] তিনিও ইংরেজী বাংলা মিলিয়ে কথা বললেন।

প্রথম কথা [illegible] ভারতীয় কেরানি আর জাহাজ ঘাটের চাবি [illegible] বড় [illegible] ওদের ধাপ্পাবাজি। ছুটি

এ জাতীয় কেরানির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তাদের মত ও পথ কিছুই বুঝি নাই। ভবিষ্যতের জন্য হুঁশিয়ার হলাম।

ডাঃ রায় সে ধরণের নন। কথাগুলা মাধুরিমা-ময়, অথচ একটা স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্য তাতে। ডাঃ রায়ের ব্যক্তিত্ব তাই আমায় সম্ভ্রম-চকিত করতো।—'ব্রিটিশরা যে ভাবে শ্যামের রাজাকে মুঠোয় রেখেছে, তাতে রাজার সুযোদ নেই সে ব্রিটিশের আওতা কাটাতে পারে, অথচ শ্যামকে শেত্রের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। তার ধর্ম্ম-স্বাধীন, তাই এখানেও প্রত্যেক বিদেশীর স্বাধীনভাবে বিচরণের স্থান। তিনি ঘোষাল [illegible] না। কি ব্যাপার।

ডাঃ রায়ের কথা শুনে হঠাৎ আর কি যেন [illegible] কথা মনে পড়লো। একটি বাঙ্গালী মায়ের ছেলে, অন্যটি বর্ম্মী-মাতার সন্তান। একের নম্বরটি অস্থি-শিক্ষায় পাকা, দ্বিতীয়টি বিভায় পি-এইচ, ডি, ডিপ্লোমায় যোগ্য। অথচ তাদের দু'য়ের চেহারায় ব্রহ্মদেশী ছাপ একটুও নাই। কোন্ ঘোষাল জিজ্ঞাসা করি নাই। বাংলার এমন প্রতিভাবান্ তরুণ, বাংলায় তাদের স্থান হয় নাই, যাতে না হয় সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ তার চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। তা হলে তারা বাংলায় ফিরে নাই। আছে ব্রহ্মদেশেই।

—ঘোষালদের কর্ম্মক্ষেত্র কতটা?

—দক্ষিণ শান্ ষ্টেট্স, কেনুতুং, মংগপান অবধি, অরণ্যের পথহীন পথে।

—লক্ষীছাড়াদের কাছে পথ আর বেপথ কি! কেনুতুং আমি দেখেছি মলয়ে প্রথম প্রবেশের মুখে। **Where there is a will, there is a way.**

—একা কেমন করে ভ্রমণ করলেন?

—যখন চোখ চলে না পা চলে না পিঠ এগিয়ে দিয়ে। রাতে আগুন জেলে গাছের গোড়ায় না হয় মাথায় বসে।

—ঠিক করেছেন। বাঘ সাপ থাকে যেখান থেকে জল কাছে। আর নিবিড় ঝোপে-বনে থাকে হায়েনা, শেয়াল, বন্য কুকুর। আগুন দেখে কোনো জানোয়ারই এগিয়ে আসে না।

—আচ্ছা ওরা কাজ করে কাদের সঙ্গে যোগাযোগে?

—মলয়ে যেমন দেখেছেন চীনা সঙ্গী, এখানে সবাই কেরান্-বেশধারী, মগ বাঙ্গালী সব তার ভিতর আছে। মগরা সেকালে ছিল দুরন্ত সে কথা আজ

প্রমাণ হচ্ছে। [illegible] এখানে থাকতে হবে, স্বামীজীর দেখা না [illegible]।

—তা, [illegible] থাকবোই। স্বামীজীর কথা আরো কেউ কেউ বলেছে, কিন্তু দেখা পাইনি।

—পাবেন দেখা। [illegible] এখানেই।

ওরা বিদায় হয়ে গেলেন। পরদিন আবার চাঁদা সংগ্রহ। দেখলাম মুসলিম ছুটি সব রকমে থাই হয়েছে, কেবল সন্ন্যাসী হয় না থাই-রীতিতে, কিন্তু তাদের থাই-পরিবার হামেশাই সন্ন্যাসিনী হয়। তবু মুসলিম ভায়ারা উদার। মলয়-নারীই দেখেছি অবরোধ মানে না, থাই-নারী তো আরো অগ্রসর, দস্তুরমত শিক্ষিত।

সে দিন চাঁদা সংগ্রহের শকল শেষ করলাম। এবার দেখতে হবে ব্যাঙ্ককের যা দেখতে বাকি। প্রতিবেশী থাই উকিলের বাড়ি যেদিন রিটার্ন ভিজিট দিয়েছিলাম, সে বলে দিয়েছিল সাগর-তীর আর এমারেল্ড বুদ্ধ দেখতে। পরদিন বেরোলাম সে উদ্দেশ্য নিয়ে।

এমারেল্ড বুদ্ধ কোথা ঠিক জানি না, তবু পাড়াটা আন্দাজ করে নিলাম লোকের কথায়। আমার ধারণা ছিল ব্যাঙ্কক শহর ছোট, খুঁজে বের করতে পারবো বৌদ্ধ-মন্দির। কিন্তু রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বুঝলাম, আরো কিছুদিন না ঘুরে দেখলে, শহরের মোটামুটি নক্সা মাথায় আসবে না। এমারেলড বুদ্ধের পরিবর্তে দেখা দিল ফুটপাথ-বিহীন রাস্তা আর দূরে একটি মন্দির, প্যাগোডা নয়।

অনুসন্ধানে জানা [illegible] আর্য-সমাজ মন্দির। চারদিকে ভারতীয়ের বাসস্থান। [illegible] তারাই যারা এদেশে প্রথম এসেছিল দ্বাররক্ষকের চাকুরি নিয়ে। [illegible] আছে সুখে-শান্তিতে বাস ক'রে ব্রত-পার্ব্বণ-বিবাহ-শ্রাদ্ধ নির্ব্বাহে [illegible] পারে সে উদ্দেশ্যেই মন্দিরটি প্রথম দেখা দেয় ব্যাঙ্ককের এ [illegible] অংশের চেহারা অন্য রকম—রাস্তায় ফুটপাথ, [illegible] দোকান-পসার। এখানে যেন ভারতীয় স্পর্শে পাড়াটা [illegible] অশিক্ষা কুশিক্ষা তাদের ঘিরে করতে [illegible] পারে থাই [illegible] বাসিন্দা হতে। তেমন লেখাও কেউ ছিল না [illegible]।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মত একজন দলপতি যদি তাদের থাকতো, তবে দুঃসাহসের ধ্বজা তুলে বলতেন—'থাই-নারী বিয়ে করে তোমরা শ্যামবাসী হও', যেমন করে অকুতোভয়তায় তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে বলেছিলেন জাপানকে—'জাপানী সেনা ভারতে প্রবেশ করতে পাবে না।' যেমন বলেছিলেন জার্মানদের—'জার্মানীতে গঠিত ভারত-সেনা রুশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না।'

হালে কিন্তু যারা আর্য্যসমাজ মন্দিরের অনুবর্ত্তী তারা করেছে বিবাহ থাই-নারীকে, কিন্তু মন্দিরেও নয়, বিবাহানুষ্ঠান-ক্রমেও নয়। থাইনারী তার বিশেষত্ব বিসর্জন দেয় নাই।

কয়েকজন আর্য্যসমাজী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো মন্দিরে। ইষ্ট এশিয়াটিক কোম্পানির টালি ক্লার্ক মিঃ তরুণ শিং বললেন—এদেশে বিপ্লবের ধোঁয়া দেখছেন, কিন্তু সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী বলে বিদ্রোহ করতে হলে তারাই করবে সাধারণে যেন সে কাজ করে না।

—কেন এমন কথা বলে ?

—বলে তাদের চালকরা, অফিসাররা যে প্রায় সবাই রাজবংশধর। রাজার উচ্ছেদ চায় না। তা বলে তারা শ্বেত সাম্রাজ্যবাদীদের নাচের পুতুল নয় রাজার মত। তারা দেখছে শ্বেতদের সঙ্গে একটা হেস্ত-নেস্ত করতেই হবে দেশকে বাঁচাতে হলে, সে একটা গুরুতর কারণ। আর একথা আপনি নিশ্চিত জেনে রাখুন যে শ্যামের আমলাতন্ত্র নিজেরাই পুঁজিপতি হতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। সে যেদিন সম্ভব হবে সেদিন শ্বেত সাম্রাজ্যবাদীদের এখান থেকে পাততাড়ি গুটাতে হবে, হয়তো ফলে যুদ্ধও বেধে যেতে পারে।

আর্য্যসমাজ-মন্দির ঘুরে দেখলাম, সুন্দর। গঠনের বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু আজও যেন অন্ধ-সংস্কারকে অঙ্গে ধারণ করে তার সকল বৈশিষ্ট্য, সকল দীপ্তি ম্লান।

আবার রাস্তায় এলাম। নতুন এক রাস্তা ধরলাম, ফুটপাথবিহীনতা যেন মনের শালীনতায় আঘাত করে। ঘুরে ঘুরে প্রকাণ্ড একটা প্রাসাদের দেউড়িতে হাজির, যেন দ্বিতীয় রাজপ্রাসাদ। দ্বারীকে প্রশ্ন করতেই সে হাসিমুখে জানালো—বিদেশী ভাই, এ প্রাসাদের মালিকই হলেন শ্যামদেশের আসল মহা-অধিরাজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণরাজা।

ওঃ এই তো সেই ব্রাহ্মণ যিনি বছরে একদিন করেন রাজত্ব।

[illegible]

[illegible] এল [illegible] প্রকোষ্ঠের চারদিকে [illegible] নিশানা। নতুনের [illegible]।

পরিচারক [illegible] এলেন ব্রাহ্মণ স্বয়ং। বিরাট প্রকোষ্ঠটার এককোণে একটা টেবিলে [illegible] সাজানো। তার পাশে বসে ব্রাহ্মণ চুল পাট করতে লাগলেন, মাথায় টিকি নাই, উৎকলীও না, হিন্দুস্থানীও না। চুলের ছাট দেখলাম দশ-আনা ছ-আনাও নয়, একেবারে যেন ইংরেজের গোরা-সৈনিক, পনর-আনা-এক-আনা বলাই সঙ্গত। পরণে লুঙ্গি, মুখে পান, পা খালি।

শান্তভাবেই বললেন পরিষ্কার উচ্চারণে —নমস্কার!

তারপর চললসই হিন্দুস্থানী বুলি, মাঝে মাঝে মলয়, শ্যাম, ব্রহ্মী ভাষাও বেশ কপচালেন। ইংরেজী কথা একটিও শুনি নাই তাঁর মুখে।

—পৈতা তো দেখছি না আপনার, আপনি হলেন ব্রাহ্মণ, ভারতের ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের শ্যাম-নিদর্শন।

—পৈতাটা হলো পরিচয়-পত্র, সর্ব সময় দরকার হয় না, তাই তুলে রেখেছি। তাঁরে আপনি ভারত ভারত করে ভুল বুঝছেন। আমরা ভারতের কেন হবো, আমরা খুন খাই, শ্যামের রসপুষ্ট। আপনাদের ভারত আর শঙ্করাচার্য্যই তো যত গোল বাধিয়েছে।

—কি রকম?

—আমরা কয়েকটি পরিবার ছাড়া আর সবাই বৌদ্ধ। ও-ধর্মটা পেয়েছিল এদেশ শকদের কাছে ভারতের রাজা কনিষ্কের সময়। পালি পুঁথি মাগধী লেখমালায় লেখা আছে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম এসে জাতিভেদ ঢুকাতে চাইলো, আমরা ব্রাহ্মণরা দিলাম বাধা। ওটা ছোট ধর্ম, আমাদের ধর্ম সব ধর্মের ওপরে, সেখানে জাতিভেদ নেই, হিংসা-অহিংসা কিছু নেই।

—তা হলে আপনারা মাছ-মাংস খেতে আপত্তি করেন না, কেমন?

—মাছ-মাংসের চেয়ে কি? শাক-সবজিরও প্রাণশক্তি আছে, এদেরও আছে। হিংসা জন্তু আহারেই প্রধান। দেহ-রক্ষার জন্ত, আত্মরক্ষার জন্ত

মাছ-মাংস প্রয়োজন। [illegible] মাছ-মাংস [illegible] মাছ আর [illegible] মাংস, প্রাণহত্যা হতে পারে বুঝে [illegible] রেখে আছে।

ভেবে দেখলাম শঙ্করাচার্য্য ছিলেন একাদশ শতকে। সেকাল থেকেই ওদের ব্রাহ্মণরা তাঁকে ভুল বুঝে 'কালাপাহাড়' আখ্যা দিয়ে বর্জ্জন করে রেখেছে। সুখী হলাম এজন্য যে এদের ভিতর অস্পৃশ্যতা নাই, জাতি বিচার নাই, ব্রাহ্মণও যে কোন বৌদ্ধ পরিবারে বিবাহ করতে পারে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সেখানে অন্তরায় হয় না বা ব্রাহ্মণত্ব লোপ পায় না।

একটু ভেবে ব্রাহ্মণ বল্‌লেন—কাল বিকালে আসবেন। এখানে সভা হবে।

—কি জন্য সভা?

—সভা কর্‌বো আপনার মত ভারতীয় অভ্যাগত পেয়েছি বলে। আমরা সকল সময়েই আধুনিক ভারতকে এ কথাটা বুঝাতে চাই যে ভারত প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম হতে পথভ্রষ্ট, আমাদের দেখে তারা শিখুক আর শঙ্করাচার্য্যের প্রচারকে ত্যাগ করুক।

ভাল লাগে না এ সব ধর্ম নিয়ে দলাদলি। আমি অক্ষমতা জানালাম সভায় যোগদানে।

—দেখুন আমি পর্য্যটক, ধর্ম্মের ধার ধারি না। তাছাড়া আমার অনেক কাজ, এ দেশ ত্যাগ করবার আয়োজন আমার বাকি।

তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে এলাম। পরের দিন আর কোথাও গেলাম না।

আবার একদিন বেরোলাম এমারেল্ড বুদ্ধ দেখতে। লজিং হাউসের কেরানি আমায় পথ বাৎলে দিল। আজ আর বিপথে গেলাম না। সোজা মন্দিরের দ্বারে এসে হাজির হলাম।

মন্দির-দ্বার বন্ধ। বাইরে কয়েকজন মাত্র দর্শক। বিদেশী, ইউরোপীয় নরনারী। ভারতীয় আমি একক। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর দ্বারের তালা খোলা আরম্ভ হলো, অনেকগুলা তালা। কোন তালা খুল্‌লে সরকারী রক্ষী, কোন তালা খুল্‌লে থাই-সমিতির লোক, আবার কোন তালা খুল্‌লে বিদেশী প্রহরী। সেখানে ভিক্ষু দেখলাম না।

সর্ব্বশেষ একজন হোমরা-চোমরা অফিসার নিজহাতে শেষ তালাটি খুল্‌লেন। তারপর ডবল দোর উন্মুক্ত হলো—সমুখে এমারেলড বুদ্ধ-মূর্ত্তি।

কোন ভক্তি-শ্রদ্ধা জানাবো না, অথচ [illegible] চেয়ে আছে সবাই, চোখে তাদের পলক নাই। অবশ্য এ সম্পদটিকে যেন তারা নয়নে ভরেই আত্মসাৎ করে নিয়ে যেতে লোলুপ। সবুজ এ মহামূল্য প্রস্তর যদি পাঁচ হাজার ডিকেল প্রতি ক্যারেট হয়ে থাকে, তবে সমূচে মূর্তিটির মূল্য কত কোটি ডলার হতে পারে তাই হয়তো হিসাব কষছিল তারা।

আমি ভাবছিলাম যে রাজা এ মূর্তি তৈরি করিয়েছিলেন, তাঁর কত ছিল ভক্তি, অর্থের প্রতি লোভ তাঁর একেবারেই ছিল না। তাই পেরেছিলেন তাঁর রাজ-ভাণ্ডারের একটা মোটা অংশকে এমনি ভাবে অকেজো করে রাখতে।

চিন্তাধারায় বাধা পড়লো। ভারতীয় সন্ন্যাসী একজন সমুখে দাঁড়িয়ে আমায় দেখে মুচকি হাসি হাসছে। আমি যখন স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম, প্রশ্ন হলো– কি দেখছো?

—দেখা অনেকক্ষণ শেষ, এখন ভাবছি কোনটা বেশি অবাস্তব—ভারতীয় সন্ন্যাসী, না এমারেলড বুদ্ধ!

অপরিচিত কেউ 'তুমি' বললে আমার মেজাজ ঠিক থাকে না। তাই ভারতীয় সন্ন্যাসীর ওপর কটাক্ষ করলাম। এদিকে চেয়ে দেখি কোথা থেকে জনতা এসে জড়ো হয়ে গেছে আমাদের ঘিরে।

সন্ন্যাসী চুপ করে থাকে না।

—এই ধৈর্য্য নিয়ে ছুনিয়া দেখতে বেরিয়েছ? পুতুল দেখা ছাড়া অন্য কিছু হবে না তোমাদ্বারা।

—বুদ্ধ-মূর্তি বুঝি পুতুল, আর তোমার জটা নিশ্চয় দেবতা? কত রোজগার হয় দৈনিক?

—তা মন্দ নয়, গুনে দেখি নি কখনো!

—চেলা-চামুণ্ডা আছে ক'গণ্ডা?

—কেন? বুদ্ধ-মূর্তিটা ঘাড়ে করে নিয়ে তোমার সঙ্গে পালাবার জন্য?

—ওঃ সে লোভটাও আছে বুঝি! তাই জটা!

—তোমার লোভ হয় না?

—অসম্ভব! এমন সবুজ পাথর হজম করবার শক্তি আমার নেই। লুকিয়ে রাখবার স্থানও নেই, পাইথোন আর সবল যে। আবার বিক্রি তো করতে হবে, সেদিকে খদ্দেরের ছাই চোখে পড়ে না। তুমি কিনবে?

—আমার কাছে ওটার মূল্য কাণাকড়িও না।

—তবে এসেছ কেন এখানে ?

—কৃষ্ণকায় বুদ্ধ দেখতে।

—তাও আছে নাকি এখানে ? আমি তো দেখতে পেলাম না। কোথায় আছে সে কৃষ্ণ-বুদ্ধ ?

—আমার সমুখে।

—দর্শন করে লাভ কাণাকড়ি বুঝি ?"

—সে তুমি বুঝবে না আজ, একদিন বুঝতে পারবে।

বলেই সে কোন্ পথে যে অদৃশ্য হলো তার তালগাছ-প্রমাণ লম্বা দেহ নিয়ে, তার ঠাহর রাখতে পারলাম না। ভিড় তারে নিয়ে গেল নিভৃতে আপন কোলে।

তবু কিন্তু লোকটার হাবভাবে কেমন অটল সহিষ্ণুতার নির্ব্বিকারত্ব। এত যে কর্কশ-কঠোর শ্লেষ, তাতেও লোকটা ধৈর্য্য হারায় নাই। এমনটি পারে তারা, যাদের কোন গোপন উদ্দেশ্য থাকে, আর পারে তারা যাদের সকল উদ্দেশ্য দিগন্তে যেয়ে চিরবিলীন হয়েছে। যে-ই হোক সে, বৈশিষ্ট্যময় জীবন সম্বল তার আছে—

"যে জন চলিয়াছে তারি পাছে সবে ধায়,
নিখিলে যত প্রাণ যত গান ঘিরে তায়।
সকল রূপহার উপহার চরণে,
ধায় গো উদাসিয়া যত হিয়া পায় পায়।"

যাক্ গে। শ্যামদেশে এসে তো গৈরিক বসনের ছড়াছড়িতে চোখে জ্বালা ধরে গেছে, তার ওপর ভারতীয় জটাধারী এসে 'তুমি, তুমি' সুরু করলে আর কত বরদাস্ত করা যেতে পারে। শ্যামকে সর্ব্ব-স্বাধীন অর্থাৎ যা-খুশি করবার স্থান পেয়ে গৈরিক উড়িয়ে খেলা যেন।

পিপাসা-কাতর হয়ে ঢুকলাম এক চীনা কাফির দোকানে। দেখি সেখানে বসে আছে সেই টালী ক্লার্ক দুটি বাঙালী, যাদেরে স্পাই বলে ডাঃ রায় করেছেন হুঁশিয়ার। তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিল আর একটি বাঙালী, কেরানি নিশ্চয়। আবার মিঃ আদি এসেও তাদের দলেই জুটলেন। তাঁর আর ছেঁড়া জামা নেই, বেশ ফিটফাট পোষাক।

মিঃ আদি আমায় দূর থেকেই ধন্যবাদ জানালেন। বল্লেন—

—ট্রাম কোম্পানীর কণ্ট্রাক্টর হয়েছি কনসাল সাহেবের কৃপায়।

—শুনে সুখী হলাম।

আর বেশি কিছু বললাম না। স্পাইওলার সঙ্গে মিঃ আদির গলাগলি ভাব দেখে মনটা বিষিয়ে উঠেছিল। পোষাক দেখে মনে হলো তিনি ততটা নিঃস্ব নন, যতটা প্রচার করেন।

কিন্তু গা জলে গেল বাঙালী কেরানিটির মুখে ন্যাকামি শুনে। সে করছে কি, হুবহু ডাঃ রায়ের কথা-বলার ভঙ্গি নকল করে আধ্যাত্মিক বক্তৃতা দিচ্ছে। আমার আর নির্লিপ্ত থাকা সম্ভব হলো না। আমিও সে সুরে বক্তৃতা দিলাম।

—Gold is gold (সোনা সোনাই)। কত প্রতারণা, কত চুরি-ডাকাতি, কত হত্যা আচরিত হয় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে জাতিতে জাতিতে সোনাকে কেন্দ্র করে, কিন্তু সে কলুষ সোনাকে স্পর্শ করতে পারে না, থাকে প্রতারক-চোর-ডাকাত-হত্যাকারীর প্রাণ-মন জুড়ে। তাই মেকি যখন সোনা বলে গণ্য হতে বাজারে মুখ বাড়ায় তখন সে কুড়ায় অবজ্ঞা, থুৎকার, পদাঘাত।

মিঃ আদ্রি বেজায় সেয়ানা, সে হো-হো করে হেসে আমার কথাটা হাল্কা করে দিয়ে এগিয়ে এল স্পাইটির অপদস্থ ঘুচাতে।

—কেরানি ভায়া! পারলে না মিঃ বিশ্বাসকে ধাপ্পা দিয়ে ডাঃ রায় বলে চলে যেতে। বাজিতে হেরে গেছ, বার কর দু'ডলার যা বাজি রেখেছ, না থাকে ধার দাও। হা-হা-হা। জানলেন মিঃ বিশ্বাস, আপনাকে ধোঁকা দেবার বাজি রেখেছিল কেরানি-ভায়া!

মিঃ আদির কথাও বিষবৎ মনে হলো। আমি তখনই বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে পড়লাম। স্পাইটার মুখ কালো—সে থ' মেরে গেছে।

দু'দিন সাগরতীরে বেড়ালাম। ইষ্ট এশিয়াটিক জাহাজী কোম্পানীর জেটি দেখে এলাম। তীরের জেটি থেকে প্রায় মাইল খানেক সাগরের জল জুড়ে ব্রিজ তার মাথায় ফ্লোটিং প্লাট্‌ফর্ম, সেখানে এসে জাহাজ ভিড়ে। নামা ওঠার সুবিধা দেখতেও সুন্দর।

দ্বিতীয় দিনে দেখা হলো মিঃ হাল ও তাঁর পত্নীর সঙ্গে সাগরতীরে। মিসেস হাল থাই হয়েও শিক্ষিতা। যে সঙ্কীর্ণতা থাইরা ধারণ করে আছে অহিংসার নাম দিয়ে তার তিনি নিন্দা করলেন। সব রকমে মহিলাটি উদার। মনে মনে বললাম—মিঃ হাল স্ত্রী-ভাগ্যে ভাগ্যবান।

পরদিন বিকালে এলেন লজিং হাউসে ডাঃ রায়। সঙ্গে আর কেউ নাই। সন্ধ্যা অবধি অনেক কথা বললেন, কিন্তু সে কথায় অন্তরের স্পর্শ ছিল না। মনে যেন তাঁর অশান্তির কালোমেঘ। অথচ মন হাল্‌কা করতে পারছেন না, সে বিবরণ প্রকাশ করে। কোথা যেন সে পথে বিঘ্ন রয়েছে। হয় তো তাঁর ধর্ম্মহীন আমিত্বের অনুভূতি সর্ব্ব-ধর্ম্মত্যাগে ধর্ম্মীর আশ্রয়, একের শরণ, প্রাণে এনেছে সংশয়।

সন্ধ্যা হবামাত্র তিনি খাবার নিমন্ত্রণ জানালেন এবং আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে। বাড়িতে ঢুকে দেখি বসে আছেন একজন গেরুয়াধারী ভদ্রলোক, মাথার চুল আমাদের মতই হালফ্যাশানে ছাঁটা। গায়ে একটা আনকোরা গেরুয়া পাঞ্জাবী। পায়ের পাম্প-স্যু বেশ দামীই হবে। পান খেয়ে ঠোঁট লাল। কিন্তু গড়ন অসাধারণ লম্বাটে।

ডাঃ রায় পরিচয় দিলেন—ইনিই স্বামীজী!

স্বামীজী বল্‌লেন—বসুন কথা বলা যাক। খাবার তৈরি হতে দেরি আছে।

ডাঃ রায় বল্‌ছেন ইনিই স্বামীজী, বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু মনটা আমার বল্‌ছে এ ব্যক্তিটির ধাঁজ-ধরণ যেন অপরিচিত নয়। পথের টানে কত লোকই তো আমার নয়ন সমুখে দেখা দিয়েছে, তাদের কারু সঙ্গে হয় তো এর চলন-বলনের একটা মিল হয়ে পড়েছে। এমন যে না হয় দুনিয়ায় তা তো নয়। হতে পারে।

আমায় চিন্তিত দেখে স্বামীজী বললেন,

—চিন্তা ছেড়ে দিন, হয়তো একটা মিল আপনি দেখ্‌তে পাচ্ছেন আমার সঙ্গে আর নো-ম্যান'স্‌-ল্যাণ্ডের তান্ত্রিক সাধুর সঙ্গে, যার হাঁক ছিল 'চাক্কা গাড্ডীকী আসোয়ার!'

—ঠিক, ঠিক, এখন মনে হয়েছে, চোখ দুটো ঠিক সেই।

—তারপর বান সেধোর স্কুল ইন্‌স্পেক্টর্‌ যে 'নমস্কার' অর্থ সাযুজ্য বলে সংস্কৃতের ব্যাখ্যা করেছিল, দেখুন্‌ তো তাকে খুঁজে পান কিনা গেরুয়া পাঞ্জাবী বর্জ্জন করে।

—বলেন্‌ কি! তাই তো, আপনি ইনস্পেক্টর না হলে বা সাযুজ্য ব্যাখ্যা জান্‌বেন কি করে।

—আচ্ছা, হাইফাই শহরে প্রবেশমুখে যে থাই তরুণেরা আপনাকে ছেঁকে ধরেছিল, তাদেরে এক ধমকে দমিয়ে দিল কে ? কে সেই লজিং ম্যানেজার ?

আমি একেবারে হতভম্ব। হাঁ, সে ম্যানেজারটি যেন কেমন ঠেকেছিল, সে পেশা যেন তাতে খাপ খায় নাই।

—হাঃ হাঃ হাঃ, সিঙ্কোরার বৃদ্ধ ভারতীয় ব্যবসাদার কে ? সিঙ্কোরার বেনিয়া মজলিশ তো সাজানো ব্যাপার, কেউ বণিক নয়। কে সেই ভিক্ষু যে প্রথম দিন ব্যাঙ্ককে আপনার কাছে থাই-নারী আর প্রচার নিয়ে বক্তৃতা দিল ? এমারেল্ড বুদ্ধ সমুখে ভারতীয় সন্ন্যাসী, কে সে ? চিনতে পারছেন, না, চিনতে পারেন নি ? মলয়েও তো কতবার দেখা পেয়েছেন। সিঙ্গাপুরের তাঞ্জাম পগারে, বুকিত মার্তাজাম-এ অন্ধ ভিখারীকে অর্দ্ধ-ডলার ভিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু ইপোর মার্‌বেল কোয়ারীতে পেলাম না হাত পেতে, সঙ্গের লোকটা সব ফাঁস করে দিল, পালাতে হলো বেমালুম। তবুও চিনতে পারেন না ? হাঃ হাঃ হাঃ—ভূপেন্ বসু বলে কোনো হতচ্ছাড়া…

—ওঃ ইয়েস্! ভূপেন্‌বাবু, ক্ষমা করুন। আমি একটা গাধা, প্রথমেই ধরে ফেলা উচিত ছিল। কিন্তু তখন যে একশ'বার 'তোমার-গে' 'তোমার্-গে' কর্‌তেন, সে অভ্যাস ছাড়্‌লেন কেমন করে ? ভারতীয় সন্ন্যাসীর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার তা হলে বেশি অন্যায় হয় নি। জটা ও গেরুয়া—দুই মেকি !

ভূপেন্‌বাবু গম্ভীর লোক, তিনি একটু হাসলেন মাত্র।

—**Let by-gones be by-gones!** অতীত ভুলে যান, আমি আজো কর্ম্মক্ষমতা হারাই নি, আপনি অন্ততঃ সে প্রমাণ পেলেন। ভারতীয় বিপ্লবীরা সারা দুনিয়ার ইংরেজ পুলিশের ভয়ে কাবু হয়ে থাকে আণ্ডার গ্রাউণ্ড। কিন্তু থাইরাজ্যে তারাও স্বাধীন। তাদের কার্য্যধারা এখানে প্রকাশ্য। স্পাই, পুলিশ চারধারে তবু আমরা কেয়ার করি না এখানে। মৃত্যুভয় তাদের, যারা হারিয়ে ফেলেছে উত্তম। যাক্, দেখা আগেই হতো লজিং হাউসে, কিন্তু সেদিন নচ্ছার আদি-টা ছিল আপনার ঘরে।

—ও-তামিলটা ভাল লোক নয়। কাল সবে টের পেয়েছি।

—আদি তামিল নয়। তা বুঝি জানেন না, ও হলো বর্দ্ধমানের লোক। চেহারাটা মাদ্রাজী ধুরন্ধর। কবে যাত্রা করতে চান এখান থেকে ?

—দু-চার দিন পরে।

—কেন ?

—একটা কথা মনে হয়, বিপুল ও মীডের সঙ্গে শেষ বিদায় নেওয়ার সুযোগ পাই নি। বেচারীরা বড্ড খেটেছে আমার জন্যে।

—ওঃ তাতে কি! ওদের দেখা আর না পাওয়াই ভাল।

—একথা বল্‌ছেন যে ?

—তাদের মত ও পথ জানেন ?

—মনে হয় তারা আমলাতন্ত্রের বিরোধী। গণবিপ্লবই তাদের কাম্য।

—তাই বল্‌ছি, কাল থেকে নতুন সঙ্গী পাবেন। (ভূপেনবাবু কি একটা সঙ্কেত বাণী উচ্চারণ করলেন, দুটি সামরিক অফিসার এল)।

অফিসার দুটিকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে বল্‌লেন—ভ্রমণকারীকে আপনারা শহর দেখিয়ে আনবেন।

অফিসার দুটি আমায় নমস্কার জানিয়ে চলে গেলেন।

—দেখুন রায়বাবু, আপনার শ্যাম সম্বন্ধে মতামত নতুন সঙ্গীদের জানাবেন না। গণবিপ্লবের কোন আলোচনা মুখে আন্‌বেন না। আর শ্যাম সরকারের কাছে কিন্তু অর্থ-সাহায্য আশা কর্‌বেন না, অন্য যে-কোন সহায়তা দরকার পাবেন। অর্থ সংগ্রহ তো আপনার হয়েছে ? তবে শহর দেখতে আপনার ব্যয় করতে হবে না।

—হাঁ, টাকা চাইনে। শ্যাই থেকে প্রটেক্‌শন পেলেই হয়।

—তা পাবেন।

বুঝলাম স্বামীজী গভীর জলের মাছ। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বড় চাল তাঁর—শ্যামের স্থল ও নৌবাহিনীর অফিসারদের ক্ষেপিয়ে তুলছেন। তাই এখন গণ-বিপ্লব আপাততঃ ধামাচাপা। ডাঃ রায়ও সে সুরের কথাই বলেছেন। তাই কি ডাঃ রায় মনমরা ?

রাত হয়েছে। পরিতোষ ভোজনের পর বিদায় নিলাম।

সামরিক অফিসারদের সঙ্গে ঘুরে দুদিনে ব্যাঙ্কক দর্শন শেষ হলো, মায় রাজ-প্রাসাদ—দোতলার ওপরে টালির ঘর। তার পর সঙ্গ ও সঙ্গী ছাড়লাম। ব্যাঙ্কক আর ভাল লাগে না। 'সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা'। যা-ও দু-চার দিন থাক্‌তাম ভারতীয় বিপ্লবীদের তাড়া-হুড়ায় ব্যাঙ্কক যেন হৃদয়হীন।

"ইটের 'পর ইট মাঝে মানুষ কীট—
নাইকো ভালোবাসা, নাইকো খেলা।"

ইতিকথার ইমারত

বিপ্লবের রং-বদল

(সাপের কেল্লা—বোধিসত্ত্বের ভক্ত—'অরণ্য প্রদেট'—ওঙ্কার বট কাহিনী)

—পালাও বিদেশী, রান্ ফর্ ইওর লাইফ।

রোদে হাড়-পোড়া হয়ে বসেছি একটা ঝাঁকড়া গাছের ছায়ায়।

একদল রাইফেলধারী তরুণী ঝোপ থেকে বেরিয়ে চীৎকার করলো,

—রান্ ফর ইওর লাইফ! (পালিয়ে বাঁচো)

বাপরে বাপ!—

গাছের ডালে ডালে ল্যাজ জড়িয়ে ফণা উঁচিয়ে ফোঁস ফোঁস করছে শ'য়ে শ'য়ে সাপ!

আবার ছুটো ধুপ ধুপ করে পড়লো মাটিতে আর ল্যাজা-মুড়ো-ধড় এক করে দিলে লাফ—কম পক্ষে দশ হাত!

কি ভয়ানক! আর এক নিমেষ নয়, ধুক্‌পুক্ করতে করতে দিলাম ছুট সাইকেলে।

গুড়ুম্! গুড়ুম্! গুড়ুম্!

পেছন ফিরে চেয়ে দেখি গাছটার সমুখ ছেয়ে গেছে আগুনের লাল ফুল্‌কিতে। তরুণীদের হাতের পিস্তল থেকে নিশ্চয়। —আর তা পাইরোটেক্‌নিক্ রিভলবার সন্দেহ নাই। অহিংসার দেশ কি না তাই আগুনের ফুল্‌কি দিয়ে সাপ তাড়ানো।

একপেয়ে পথটা দিয়ে বড় রাস্তায় পড়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। তরুণীরা এল।

—ও-গাছটা সাপের কেল্লা, কেউ যায় না ওখানে। একটা লোক স্ত্রী-হত্যা করে ও-গাছে ফাঁসি লটুকে মরেছিল। সে মড়া কেউ পোড়ায় নি। তাই সে-লোকটাই সাপ হয়ে জন্মেছে এখানে, গায়ে যত চুল ছিল ততটা। এ আবার উড়ুক্কু সাপ, আট-দশ হাত লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। ভাগ্যিস ঠিক সময়ে আমরা এসেছিলাম, নইলে উপায় ছিল না।

—তা না হয় হলো, কিন্তু তোমরা গুলী করলে না যে?

—নিয়ম নেই বোবা-জন্তুর ওপর হাত তোলবার, নেহাৎ জীবন বিপন্ন না হলে।

—তবে রাইফেল বয়ে বেড়াও কেন ?

—অপরাধীকে শাস্তি দিতে।

—অপরাধী তো মানুষ, মানুষ মারবার নিয়ম আছে বুঝি ?

—বিদেশীরা বোঝে না সে কথা। বোধিসত্ত্বের নাম শুনেছ ? তিনি ভগবান সিদ্ধার্থের নিম্নস্থ মহাপুরুষ। তিনি বলে গেছেন—'মার' আর তার চেলা-চাপাটি মানুষগুলা দুষমন। শয়তান। এদের নিপাতে হিংসার প্রশ্ন ওঠে না। এটা বেকসুর কর্তব্য। পালি গ্রন্থ 'পঞ্‌হো' (প্রশ্ন) পড়লে এ-সব বুঝা যায়।

এতক্ষণ দলের নেত্রী কোন কথা বলেন নাই, এবারে তিনি এগিয়ে এসে বললেন,

—এ তো গেল ইতিকথা। প্রকৃত কারণ হলো—এতগুলা সাপ একসঙ্গে চড়াও হলে কত গুলী করবো আমরা॰ তেরটা মাত্র রাইফেলে। যে-টার গায়ে গুলী লাগবে না, সেটাই এসে কামড়াবে। তার চেয়ে আতস বাজির আগুনে সাপ তাড়ানো নিরাপদ। আগুন দেখে পিছিয়ে যাবে। এ-তল্লাটে সাপের ভয়টা বেশি বলে আমরা পাইরো-পিস্তল নিয়ে হামেশা চলি। বিশেষ করে আমাদের গাঁ-টা বনের ভিতর। পথ একটা আছে, কিন্তু আমাদের দেরি হয়ে গেছে বলে শর্ট কাট করেছি বেপথে।

কথা শেষ করেই নেত্রী দিলেন অর্ডার—Form fours। (ফর্ম ফোর্‌স্)

তারা তিন লাইনে চারজন করে পাশাপাশি দাঁড়ালো। নেত্রী পেছনে একক।

—কুইক্ মার্চ্চ ! বিদায় বিদেশী ! আমরা প্যারেড্-এ যাচ্ছি।

—ধন্যবাদ ত্রাণকর্ত্রী পল্টন ! বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক !

সমস্বরে তারা চেঁচিয়ে উঠলো—আমরা বিপ্লবী নই। জাতীয়তাবাদী থুন্-থাইয়ের জয় !

তারা গেল বড় রাস্তা ধরে পশ্চিম দিকে। আমার পথ উল্টো দিকে। ব্যাঙ্ককে দেখে এলাম সেয়ানা স্বামীজী সেনা-বাহিনীকে উত্তেজিত করছেন শ্বেত-বিদেশীর বিরুদ্ধে। এখানকার এরাও দেখ্‌ছি গণবিপ্লবের দলের নয়। তার কারণ বোধ হয় এখান থেকে কম্বোজ, ইন্দোচীন কাছে, শ্বেতরা সেখান থেকে স্পাই পাঠিয়ে ষড়যন্ত্র করে এ-অঞ্চলের লোকদের করেছে অতিষ্ঠ। তাই এরা শ্বেত-বিরোধী, রাজার বিরুদ্ধে এদের লক্ষ্য নয়।...

এশিয়ার প্যারী বলে খ্যাতিকামী ব্যাঙ্কক-বাসীকে বর্জন করে একদিন বেরিয়ে পড়লাম তল্পি-তল্পা নিয়ে। আমার সম্বল তো তারের খাঁচা, ঝুলিয়ে নিলাম সাইকেলে। শহর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পূব মুখের পথ ধর্‌লাম।

আধ ঘণ্টা যেতে না যেতেই বৃষ্টি এল। ভিজে ভিজে সাইকেল চালাতে বেশ আরামই বোধ কর্‌লাম। রাস্তার ধারের একটা ডোবা খাল থেকে কিলবিল করে মাছ উঠে আস্‌ছে ডাঙায়, খালের পাড় বেয়ে যে বৃষ্টিপাতের সরু সরু জল-ধারা নামছে তার উজান্ ঠেলে।

এত মাছ জড়ো হয়েছে, তামাসা দেখ্‌তে বৃষ্টির ভিতরই দাঁড়ালাম।

—কি দেখছেন ভাই? [অপরিচিতের কণ্ঠস্বর।

—মাছের খেলা।

—আপনি বুঝি মলয়বাসী?

—না, ইণ্ডিয়ান। এ প্রশ্ন কেন?

—এজন্য যে কোন থাই -এ মাছ তো ধরবেই না, তাকাবেও না এদিকে।

—কেন?

—এ-সময়কার মাছে ডিম-ভর্‌তি, এ মাছ প্রাণান্তেও মার্‌বে না থাইরা। তা ছাড়া জ্যান্ত মাছ তো এরা কোন কালেই কাটে না, অহিংসার ভড়ং। অথচ মানুষ মারবার সময় সে কথা মনে থাকে না।

—বোধিসত্ত্বের দোহাই দিয়ে ওরা সব কিছু হিংসা কর্‌তে পারে।

—ওই আর একটা ধোঁকা দেবার ফিকির। আমাদের দেশে এ-সব চালাকী নেই।

—তুমি তা হলে থাই নও, কোন্ দেশের তুমি ভাই বন্ধু?

—নবদ্বীপ থেকে এসে থাই বনে গেছি, তবে মনে প্রাণে নয়।

—যদি কিছু মনে না করো, কি কাজ কর বলতো ভাই।

—মনে আবার করবো কি? আমি কাপড় রঙ্গাবার কাজ করি। তাই সাইকেলে রাজধানীতে যাচ্ছি ভাল রং আন্‌তে। আমাদের 'অরণ্য প্রদেট' শহরে ভাল রং মিলে না।

—একাই কাজ কর?

—না, আমার থাই-পত্নীও সাহায্য করে।

—তা হলে বেশ সুখেই আছ!

—না, থাই-নারীগুলা বড্ড তেরিয়া। আচ্ছা বিদায় ইণ্ডিয়ান্, বেশি সময় মাছের কাছে দাঁড়াবেন না, থাইগুলা দেখ্‌লে সন্দেহ কর্‌বে মাছ ধর্‌ছেন। তা ছাড়া মাছ খেতে সাপও আসে, সেগুলা ভয়ানক।

—মাছ ধর্‌তেও মানা নাকি? সন্দেহ কর্‌বে?

—ডিম-ভরা মাছ কি না, এগুলাকে মেরে ফেল্‌লে মাছের জন্মহার কমে যাবে যে।

সাইকেলে উঠলাম। মনে মনে ভাব্‌ছি সাধারণ লোকও এদেশে কত হুঁশিয়ার, কত সু-রীতিতে শিক্ষিত। থাইদের দৃষ্টি তো তা হলে বেশ সূক্ষ্ম।

তা হলেও যবদ্বীপী বৃদ্ধের স্পষ্ট কথাগুলা যেন মায়া-জড়িত, কেমন একটা দোলা লাগ্‌লো প্রাণে ওর দাম্পত্য জীবনের দুঃসহ অশান্তির রেশে। দেশ-ত্যাগীর নিরালা পরগাছা-সত্তায় স্বপ্নের প্রলেপ দিতে পারে নারী, সে নারীই যখন তেরিয়া ত্রিপণ্ডা থাই, তখন বেচারার সুখ নাই সংসারে।

ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গিয়ে রোদ উঠেছে। এক ঘণ্টা পুরো ভিজেছি, কিন্তু অল্প সময়েই আমার ভিজে পোষাক শুকিয়ে গেল। উল্টে গায়ে জ্বালা ধর্‌লো রোদের গরমে।

ঘেমে-জুমে নাকাল হয়ে একটু ছায়া খুঁজছি। রাস্তা থেকে হাত পঞ্চাশেক দূরে একটা ঝাঁকড়া গাছ—মোটা মোটা শিকড়গুলা মাটির ওপর গা ভাসিয়ে আছে। পিছনে নিবিড় বন। বড় রাস্তা থেকে এক পেয়ে পথটা দিয়ে গিয়ে সবে বসে পড়েছি একটা মোটা শিকড়ের ওপর। আমার বাঁ দিক থেকে যেন কণ্ঠস্বর ভেসে আস্‌ছে। তাকালাম সেদিকে। একে একে তেরটি রাইফেলধারী থাই-তরুণী ঝোপের গাছ-লতা দু-হাতে ফাঁক করে বেরিয়ে এল। এসেই চীৎকার —**Run for your life! Mr. Foreigner!** তারপর যা ঘটলো আগেই বলা হলো।...

.. ..

আবার পূবমুখো চলেছি। শুধু আজ নয়, শ্যামদেশের আদ্ধেকটাই পাড়ি দিয়ে আস্‌ছি—পূবদিকে মুখ রেখে, সিঙ্গাপুরের হার্বার মাষ্টার সাহেবের নির্দেশ পালন করে। আজ রাইফেলধারী থাই-তরুণী দেখে কত কথা মনে উদিত হয়। আমাদের দেশে তরুণীদের দুটি একটির মাত্র নাম শুনা যায় যে পিস্তল নিয়ে

ডান্‌পিটেপনা করেছে। কিন্তু এদেশে দেখ্‌ছি পল্টন তৈরি হতে যাচ্ছে নারীদের নিয়ে। সাহস এদের অদম্য।

দূরে একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে, গ্রাম হলেও বেশ লম্বা-চওড়া। কিন্তু প্যাগোদার চূড়া নজরে পড়ে না। অপরাহ্ণ বেলায় সে গ্রামে প্রবেশ কর্‌লাম। ইচ্ছা করেই থাই লজিং হাউসে গেলাম।

ঢুকতেই একটা 'মার্ মার্' ধ্বনি কানে এল। তারপর চীনা-পরিচারিকা একটা লাঠিতে করে সন্তো-নিহত সাপটাকে নিয়ে চলে গেল বাইরে। সাপটা তিন হাত লম্বা হবে। গা শিউরে ওঠে দেখে। ম্যানেজারকে প্রশ্ন করে জানলাম যে সাপটাকে ফেল্‌তে যায় নাই চীনা-নারী, কসাই দোকানে গেছে নিয়ে। কেটেকুটে এনে রান্না করে খাবে। এ-অঞ্চলে সব লজিং হাউসেই চীনা-পরিচারিকা।

রাতে শোবার পর কেবলই শঙ্কা হয়—এই বুঝি সাপ এল। আর দিয়েশলাই ধরিয়ে শুয়ে শুয়েই মশারির ভিতর থেকে নজর বুলাই চারদিকে। এমনি করে কতবার যে ঘুম ভাঙ্গলো তার ঠিক নাই। ভাল ঘুম হয় নাই, তবু এখানে আর দ্বিতীয় রাত কাটাতে আগ্রহ ছিল না। কিন্তু ভোর থেকেই বর্ষণ সুরু হলো। আজ আর ভিজ্‌তে প্রাণ চায় না। যাত্রা বন্ধ রাখলাম।

লজিং হাউস ম্যানেজার এসে গল্প জমালো ব্রিটিশের স্পাইদের সম্বন্ধে। তবে আমায় অভয় দিল—এ লজিং-য়ের ত্রিসীমায়ও স্পাইগুলা আস্‌বে না নাকালের ভয়ে।

বৃষ্টি থাম্‌লে পরে রাস্তায় বেরিয়ে ভিক্ষু দেখলাম কয়েকটি, তারা বার বার কট্‌মট্ করে আমার দিকে তাকালো। তাদের দৃষ্টি এড়াতে জোরে সাইকেল প্যাড্‌ল্ করে এগিয়ে গেলাম। সরু গলিপথে ঢুকি না, নইলে সব রাস্তাই তো আমার কাছে সমান। পাশাপাশি কয়েকখানা সুন্দর বাড়ি যেন সম্ভ্রমে অন্যগুলা থেকে পৃথক্।

একটা বাড়ি থেকে একজন থাই এসে ডাক দিল। তার চোখ লাল, পানের রসে মুখ-ঠোঁটও লাল। তার সঙ্গে তার ঘরে ঢুকলাম—দেওয়ালে তলোয়ার বন্দুক। লোকটি পরিচয় দিলেন, তিনিই এ স্থানের কামনান্।

প্রথমই তিনি জানালেন—পথে চলবেন হুঁশ রেখে সাপগুলাকে এড়িয়ে আর ওই যে দেখা যাচ্ছে বনে-ঢাকা পল্লী, ওখানে স্থানীয় লোক না নিয়ে

যাবেন না। ওরা বুনো জাত, বেজায় একরোখা, কথায় কথায় হাতিয়ার চালায়।

—ওরা কি থাই নয়?

—না, কম্বোজ বুনো শাখা জাতি। কিছুটা থাই ভাষা শিখেছে। তবে ওদের বুলি কতকটা আমাদেরই মত, তাই আমরা বুঝি ওদের কথা, ওরা কিন্তু বোঝে না শ্যামভাষা। আর একটা জাত পথে পাবেন, ক্ষমীর জাতি, মাছ-মাংস খায় না। তারাও কমতি নয়।

তারপর এল সামসু মদ্য। আমি একচুমুক খেয়ে রীতি রক্ষা করলাম। কামনান পান করলেন আকণ্ঠ। কিন্তু বেসামাল হতে দেখি নাই। নারী বাহিনীর কথায় বললেন—দেখেছেন তা হলে। এ আমাদের তোড়জোড় শ্বেত-বিদেশী তাড়াবার।

বিদায় নিয়ে এলাম। পথে পড়লো একটা ডাকঘর। আমার অটোগ্রাফ বই নিয়ে ডাকটিকেটের ওপর সিল বসিয়ে আনলাম।

তার পরের দিন পথে এগিয়ে চললাম। মাঝে মাঝেই দু'রকমের মন্দির—ইটের আর পাথরের। ইটের মন্দির আধুনিক, তাতে স্থান পেয়েছে বুদ্ধ-মূর্ত্তি। পাথরের মন্দিরগুলা অতি প্রাচীন, তাতে গণেশ ও অন্য দেবদেবীর অধিষ্ঠান, তবে সর্ব্বত্রই গণেশ ঠাকুরটির ছড়াছড়ি, শ্বেতহস্তীর এলাকা ছিল কিনা এককালে, তাই গজানন সকলের হৃদয়ের রাজা ছিল।

লজিং হাউসের অভাব নাই, শ্যামের এ রাস্তায় আর লজিং হাউসে উঠি নাই। আমাদের দেশের নাগা, কুকি প্রভৃতির মত ক্ষমীর আদিম জাতি এখানে বিস্তর। তাদের বাড়িতেই ,আশ্রয় নিতে আমার ভাল লাগতো, যেন ভারতীয় আবহাওয়া পেতাম। বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে এরা কেউ মাছ-মাংস খায় না, তা বলে দুধ-দইও ব্যবহার করে না। কিন্তু স্বাস্থ্য এদের চমৎকার।

পথে যেখানে পাহাড় নেই সেখানেই খোয়াখালে বড় বড় মাছ। আমি সেই মাছ ধরে রান্না করে খেতাম। নিরামিষাশী ক্ষমীর জাতীয় লোকেরা আপত্তি করতো না। ওঙ্কার বটে যে জাতি দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিল, তারা ক্ষমীর জাতি। এ আদিম জাতিরা তাদেরই শাখা-প্রশাখা। যতদূর ক্ষমীর এলাকা ছিল, সব জায়গায়ই মহাদেব আর গণেশ মূর্ত্তি দেখা যায়।

এই যে প্রাচীন ক্ষমীর জাতি এরাই সেকাল থেকে ভারতীয় হিন্দুধর্মের রীতি নীতি কিছুটা বহাল রেখেছিল, তবে নতুন দেশে এলে হিন্দু-ধর্ম অনেক রকমেই বিকার প্রাপ্ত হয়, এখানেও তাই ছিল। এদের ভিতর এসে দুধ-দইয়ের কোন অভাব বোধ করি নাই, কারণ এরা নারিকেলের দুধ দিত। পান, সুপারি, নারিকেল এখানে পথে ঘাটে। পয়সা দিয়ে চুন্ কিন্‌লে ফাউ পাওয়া যেতো একটা পান আর সুপারি।

দ্বিতীয় দিন যে পাড়ায় গেলাম তারা হুবহু গুরখা চেহারার। এত ফর্সা রং শ্যামদেশে আর কারু দেখি নাই। গুরখা হলেও চীনাদের মত নাক চেপ্টা নয়। এসব ভারতীয় আকার-প্রকার দেখে আমি প্রতিদিন দশ মাইলের বেশি পথ চলতাম না। অভিপ্রায় যতদিন পারি এদের ভিতর থেকে যাই। এ পল্লীবাসী আমায় এমন চাল এনে দিল যা রান্না করতে হলো না। ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে রাখতেই ঘণ্টা খানেকে খাসা ভাত তৈরি হলো। বুঝলাম এদের স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য এ রকম বলকারক ভাত থেকেই।

এদের ভিতর চোর ডাকাত নাই। সাপও চোখে পড়ে নাই। সারা থাইরাজ্যে এমন সুখে আমার দিন আর কাটে নাই। ক্রমে পাহাড়-পর্ব্বতের সংখ্যা কমে এল, চীনা লজিং হাউস ও তৎসহ স্পাই বেড়ে চল্‌লো। আমি বেপরোয়া, স্পাই আমার করবে কি। কোন চীনা লজিং হাউস কিম্বা 'ইটিং হাউসে' ঢুকি নাই। কাজেই স্পাইগুলা অনেক সময়ই আমার খবর রাখ্‌তো না। সন্ধান পেয়ে কাছে এলেও দিতাম ধাপ্পা—সিঙ্গাপুরের বড় সাহেবের চিঠি দেখাতাম। তারা খুশি মনে চলে যেতো।

প্রতিদিনই দেখা হতো সাইগন-যাত্রী ছোট-বড় দলের সঙ্গে। তাদের ভিতর যারা ভারতীয়, তারা এ অঞ্চলে ঘাগী। প্রাণ গেলেও সত্য খবর দিত না সাইগনের। এরা সব দোকানদার। মিথ্যাবাদী বলে এদেশে এরা ডাকসাইটে।

আর একদিন পেলাম চীনা তরুণের দল। তারা আমায় লজিং হাউসে নিয়ে যেতে জেদ ধরলো। আমি রাজি হলাম না, কিন্তু সারাদিন তাদের সঙ্গেই আনাগোনা করলাম। আমার মতিগতি বুঝে তারা বেছে বেছে পাথরের প্রাচীন মন্দিরে নিয়ে যেতো। দেখতাম সেখানে শিবলিঙ্গ, গণেশ মূর্ত্তি।

এরা সঙ্গে থাকায় আদিম জাতিদের সঙ্গে কথাবার্ত্তার সুবিধা হলো। আমি শ্যাম-ভাষা ভাল বুঝি না, আগেই বলেছি বিশুদ্ধ বাংলা দিয়ে কোন রকমে কাজ

চালাতাম। ওরা আবার মলয় ভাষা জানে না। আদিমদের নিজের ভাষা আছে, তা ছাড়া ওরা সবাই শ্যামভাষা লিখ্‌তে পড়তে শেখে। চীনারা সব ভাষাই জানে।

আমি এদের সঙ্গে পথ চলতাম। ওরা পদব্রজে। আমি এগিয়ে যেয়ে বিশ্রাম করতাম, না হয় সাইকেল হাতে করে ওদের সঙ্গেই হাঁটতাম। ওরা যেতো লজিং হাউসে আমি খুঁজে নিতাম কমীর শাখা জাতির আশ্রয়।

ক'দিন পর ওরা ধর্‌লো উত্তর মুখো পথ—কুমিং শহরে যাবার জন্য। সেটা নাকি কমিউনিষ্টদের আড্ডা। নানা বেশে তারা শ্যাম ও ইন্দোচীনে প্রবেশ করে। আমার পথ ভিন্ন। আমি পূব মুখেই লেগে রইলাম। রাস্তায় এগিয়ে এবার দেখলাম সাইগন-যাত্রী চীনা দোকানীর দল, ভারতীয় বেকার দল।

আমি যে পল্লীতে অতিথি হলাম, ওরাও সে পল্লীতে লজিং হাউসে স্থান করে নিল। আলাপ হলো তাদের সঙ্গে। ভারতীয়রা সঙ্গে করে এনেছে নতুন লোক, তাদের ভাবনা ধরেছে কেমন করে পাসপোর্ট পাবে, কেমন করে অবশ্য প্রদেটে ইমিগ্রেশনের ভারপ্রাপ্তদের হাতে অল্পে রেহাই পাবে। চীনারা সে ভাবনা করে না। তাদের ও-সবের ঝামেলা নাই, নাম বাপের নাম বদলাতে এক নিমেষ লাগে না, দেশ পাল্টাতে তো ওরা ওস্তাদ। 'চাংসা'-কে 'সাংচা' কর্‌লেই হলো। আইনের ভয় রাখে না।

এ ভাবে ক'দিন চলেছিলাম তার হিসাব রাখি নাই। সেদিন রাস্তার পাশে একটা ছোট পাহাড়-চূড়া জুড়ে প্রকাণ্ড একটা গাছ দেখলাম। গাছটার বেড় হবে কলকাতার ইডেন গার্ডেনের প্যাগোদাটির গোড়ার মত। প্রায় পনর ষোল ফুট ওপরে যেখানে তিন্‌টি ইয়া মোটা শাখা তিন দিকে গিয়েছে সেখানে পাটাতন করে, তার ওপর সুন্দর একখানা কাঠের ঘর তৈরি করা হয়েছে। পাহাড়টার গায় ধাপ কেটে দেওয়া, উঠতে নামতে কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু ঘরে ওঠবার সিঁড়ি কোথা দেখ্‌তে পেলাম না। সেখানে লোকজন বাস কর্‌ছে। নিশ্চয়ই জলের ব্যবস্থা তা হলে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে মনে হলো কবির বাণী—

'মৃত্তিকার হে বীর সন্তান,
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান
মরুর দারুণ দুর্গ হতে ;...
শ্যামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিলে অদম্য নিষ্ঠায় ;...'

ততক্ষণে পথচারী সাইগন-যাত্রীরা এল। তারা বললে—অরণ্য প্রদেট আর বেশি দূরে নয়। চীনারা বললে—তারপর সীমান্ত আট-দশ মাইল দূরে। সীমান্ত পার হয়ে পাবেন ইন্দোচীনের শ্রীস্বপন, তারপর আঙ্কোর (ওঙ্কার)। সেকাল থেকে হিন্দু সভ্যতার বিখ্যাত স্থান চীনের মত। কিন্তু আঙ্কোর ভাল জায়গা নয়, স্পাই পায় পায়।

দূরে একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছিল, ক'দিন থেকেই, আজ আবার তার আবছা দেহ পরিস্ফুট আকার নিয়ে হাতছানি দিল। কিন্তু যে গ্রামে আমরা প্রবেশ করলাম সেখান থেকে পাহাড়টা এখনও অনেক দূরে।

আমি লজিং হাউসে গেলাম না। একেবারে গ্রামের উত্তর সীমা ছাড়িয়ে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর পেলাম ক্ষমীর শাখা জাতি। তাদের অতিথি হলাম। এদের চেহারা ভারতের অযোধ্যা অঞ্চলের লোকের মত। তেমনি বুকের পাটা, তেমনি দীর্ঘকায়। আহার এদেরও নিরামিষ।

গৃহস্বামী থাই ভাওন কিছু শিক্ষা পেয়েছে। দু-চারটে ইংরেজী বুলি মুখে। তার ফলের বাগান আর সব্জি বাগ। মেয়েরাও স্বাস্থ্যবতী। রান্নায় নিপুণ, ঘর বাড়ি পরিষ্কার। ভারতের মামুলি তারিফ তাদের মুখে প্রকাশ পেলেও ভারত থেকে এসেছে এ কথা স্বীকার করে নাই।

যতগুলা শাখাজাতি এ পথে দেখলাম সবার মুখেই ক্ষমীর জাতির ক্ষমীরাণীর গল্প যার রাজ্য ছিল ওঙ্কার বটে। সে রাণীরই বংশধর বলে এরা গর্ব্ব করে। নইলে শ্যামের অযোধ্যা রাজ্যের নরপতি রাজারাম যে ওঙ্কার বট অধিকার করেছিলেন, সে কথার লেশও ওদের মুখে নাই। হয়তো ওঙ্কার রাজ্য জয় করেছিল বলে রাজারাম এদের সুনজরে নাই।

পরের দিন পেলাম 'অরণ্য প্রদেট্' শহর। তাকে গ্রাম বললেই চলে। এখানে উঠতে হলো এক লজিং হাউসে। তবে তার পরিচালক ছিল একজন থাই।

যে পাহাড়টা দেখে আকর্ষণ জাগছিল সে-টা এবার মনে হলো হাতের কাছে। ছোট পাহাড় হলেও এ মুলুকে আর পাহাড় নাই, তাই ওটা যখনই নজরে পড়তো তখনই মনে হতো ছুটে গিয়ে দেখে আসি। কিন্তু সে পথে আবার কত সাপ আছে কে জানে।

বিকাল বেলা বেড়াতে বেড়াতে দেখলাম একটা গ্রীক হোটেল। গেলাম ভিতরে। থাই বৈমানিক রয়েছে অনেকগুলা। সাইগন-যাত্রী নানা জাতের,

ভারতীয়, আলজিরীয়, চীনা। কতকগুলা গোপন পুলিশ মনে হলো নিশ্চয়ই ইংরেজ আর ফরাসী সরকারের। শ্বেতকায়ও আছেন কয়েকটি নিজ নিজ সরকারের তরফ থেকে খবরদারী করতে, গোপন সন্ধানীদের চালাতে, জানা আছে তাদের যে রাজা প্রজাধিপক বাধা দেবে না। শ্বেতদের এ খবরদারী ব্যবস্থার কারণ হলো এই যে অরণ্য প্রদেশে শহর শ্যামের শেষ জনপদ। আর মাইল দশেক পূবেই ইন্দোচীন সীমান্ত।

পরের দিন রাত ভোর না হতেই ঝড়ো হাওয়া আর প্রবল বারিপাত। মনটা দমে গেল। কিন্তু বিকাল বেলা মেজাজ খোশ হয়ে গেল যবনীপী সে বৃদ্ধকে পেয়ে। সে ফিরে এসেছে ব্যাঙ্কক থেকে তার সওদা নিয়ে। সে আমায় বললে আরো ক'দিন থেকে যেতে।

—দেখুন মিঃ ইণ্ডিয়ান, কম্বোজ বুনোদের পাড়াটা দেখে যাবেন। আমি কম্বোজ বুনোদের কাপড় ছুপিয়ে দি। গিয়ে কাপড় নিয়ে আসি আবার রং করে পৌঁছে দি। ও-জাতটা অহিংসা মানে না, ফায়া-ফুঙ্গি মানে না, থাইদের তা পছন্দ নয়। কাল সকালে যাবো কি বলেন! (ফায়া—দেবতা, ফুঙ্গি—সন্ন্যাসী, বিশেষতঃ বৌদ্ধ)।

পর দিন গেলাম বুনোদের পল্লী, ঠিক যেন সাঁওতাল সম্প্রদায়। মাচা-ঘর দূর থেকেই চোখে পড়লো। সর্দারের ঘরে গিয়ে দেখি সেখানে পল্লীবাসী নরনারী সমবেত। উঠানে একটা কলাগাছ পুঁতে, তার সঙ্গে এক তরুণীকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

—ব্যাপার কি?

বৃদ্ধ বললে হেসে—ভয় পাবেন না। তরুণীটির বিয়ে। যার সঙ্গে বিয়ে তার স্ত্রী মারা গেছে গেল মাসে, দ্বিতীয় পক্ষের বর কিনা, অথচ কনে কুমারী। তাই কলাগাছের সঙ্গে তরুণীর বিয়ে দিয়ে পরে কলাগাছ কেটে ফেলে তাকে বিধবা করে, মৃতদার বরের সমপর্য্যায়ে নেওয়া হবে, তার পর হবে বিয়ে।

—পুরোহিত আছে?

—না, সর্দ্দার বললেই বিয়ে হয়ে গেল। কেবল পল্লীবাসীদের খাওয়াতে হয় ভাত, মাংস আর মদ। তাই বিয়েতে এদের খরচ আছে। গেল সপ্তাহেই বিয়ের কথা শুনে গেছি।

—টাকা কোথা পেল?

—কেন, এরা জন্তু-জানোয়ারের চামড়া আর হাড় বিক্রি করে শ্বেতকায় ব্যবসায়ীদের কাছে। তা ছাড়া এক রকম ঘাস-দানা এদের প্রচুর জন্মে। তা চালান হয় মদ তৈরির ভাটিখানায়। সে ঘাসদানা বেটে ড্যালা পাকিয়ে নারকোল তেলে ভেজে মধুতে ডুবিয়ে রাখে। দু তিন দিন ধরে তাই খায়।

সর্দ্দার মদের ভাঁড় এগিয়ে দিল আমার দিকে।

—আমাদের বিয়ের কথা তো শুন্‌লেন? কেমন মনে হয় আপনার?

—বেশ ভাল। দোষের কি আছে এতে! ভারতেও কোন কোন সম্প্রদায়ে এ-রীতি আছে।

সর্দ্দার যেন ফুলে উঠ্‌লো দেমাকে—

—শুনে নে তোরা আসল ইণ্ডিয়ান্ কি বলে। তোরা নাচিস্ ক্ষেপাদের কথায় আর থাইগুলার বেয়াড়া বোল্‌চালে আমাদের পুরাতন রীতগুলা ছাড়্‌তে চাস্। আরে নিয়ে আয় ভাত, মাংস অতিথির জন্য।

আমি খেতে বসলাম, চমৎকার রান্না। বাঁশি বেজে উঠ্‌লো আর মাদল জাতীয় যন্ত্র। ওরা তলোয়ার বল্লম নিয়ে নাচ সুরু করলো, মেয়ে-মোরদ একসঙ্গে। মেয়েগুলার হাতে আবার বন্দুক। নাচও সাঁওতালী ধরণের, সকল পাহাড়ে আর বুনোদের নৃত্যই বুঝি একাকার।

ফিরে এলাম আমরা। পথে একটাও সাপ দেখি নাই। বৃদ্ধের কিন্তু কম্বোজ পাড়ায় সেদিন কোন কাজ হলো না। কাপড় মিলে নাই ছুপিয়ে দেবার। শহরে এসে বৃদ্ধের ডেরায় ঢুকে পড়্‌লাম। সে তার ইতিহাস বলে চল্‌লো।

—যবদ্বীপে এ-রংয়ের কাজই কর্‌তাম। ডাচ্‌রা বসালো কাপড়-ছোপাবার কারখানা-কল। কিন্তু মজুরী তাদের বেশি পড়ে, আমাদের কাবু কর্‌তে পার্‌লে না। তখন রং যাতে আমরা না পাই তার ব্যবস্থা কর্‌লো। আমরা মশলা জানি রং পাকা কর্‌বার, কাজেই সাহেবদের ফন্দি ফেঁসে গেল। তখন এসে আমাদের ফুসলাতে লাগলো ওদের চাকুরি নেবার জন্য। আমরা কেন তা নেব। কথায় কথায় হলো মারামারি।

—মকদ্দমা চল্‌লো বুঝি?

—হাঁ আমার নামে বেরুলো হুলিয়া, আমি হলাম পলাতক। ত্রিসংসারে আমার কেউ ছিল না। আমি রাতে একটা চীনা জাহে করে পাড়ি দিলাম কম্বোজ দেশে। সাগরতীরে নেমে চল্‌লাম বন-জঙ্গল-জলা পার হয়ে। প্রাণ

ওষ্ঠাগত। অবশেষে পৌঁছলাম ক্রাত (কিরাত) গ্রামে। সেখানে 'সুবিধা হলো না। তারপর ক্রমাগত বারো দিন হাঁটাপথে এদিকে এগিয়ে এলাম। সে যে কী কষ্ট, তা আপনি কিছু বুঝ্‌বেন। খাওয়া নেই, রাতে ঘুম নেই, আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। তখন মঙ্গলবোরীর পথে দেখা পেলাম দেবতার।

—দেবতা? সে কেমন?

—দেবতাই তো, সবাই ডাকে সোয়ামীজী। তিনি আমায় এখানে এনে এ-কাজে বসিয়ে দিলেন। সে আজ তিন-চার বছর আগের কথা।

—বেশ, কাজ করে যাও ভাই। কাজেই শান্তি।

তারপর যে ক'দিন 'অরণ্য প্রদেটু' শহরে ছিলাম রোজ গিয়ে বৃদ্ধের কথা শুনে তৃপ্তি পেতাম। তার মতিগতি আমার বড়ই ভাল লাগ্‌তো।

কিন্তু আমার যখন এগিয়ে যেতেই হবে, আর বেশি ঘনিষ্ঠতা জমিয়ে কি হবে। রাত ভোরে যাত্রা আমার, বিদায় নিতে গেলাম বৃদ্ধের কাছে।

বৃদ্ধ বল্‌লে—আর দুটো দিন এখানে থেকে যান। ওই যে পাহাড়টা ওখানে থাকে একটা বুনো জাত, তারা ক্ষমীর শাখা জাতি। সেখানকার একটা লোক এয়েছে। সে বল্‌ছে দেড় শ' বছরের বুড়ী এক সন্ন্যাসিনী তাদের ওখানে আছে, সে নাকি ক্ষমীরদের ক্ষমারাণীর বংশের সন্তান। যাবেন দেখ্‌তে?

—যেতে পারি ভাই, তুমি যদি বলো। ও-পাহাড়টা কেন যেন প্রথম দিন থেকেই আমার মনকে টান্‌ছিল।'

—তবে আর কথা নেই, কালই চলুন লোকটার সঙ্গে, আমিও যাবো।

—ক্ষমীরাণীর নাম তো অনেক শুনেছি এ তল্লাটে, ওঙ্কার বটের নামওতো চীনারা পর্য্যন্ত বল্‌লে, তা হলে দেখেই আসা যাবে কাল। কতদূর?

—অন্ততঃ ছ ঘণ্টার পথ, কাল আর ফেরা যাবে না।

—বেশ।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে ঢুকেছি একটা নতুন পাড়ায়। আধভাঙ্গা একটা পাথরের মন্দির। কিন্তু গণেশ ঠাকুরটি এক কোণে মেঝেয় পড়ে আছে, যে মোটা পাথরের ওপর মূর্ত্তি বসানো থাকে, সে পাথর নাই, সেখানে গর্ত্ত। লজিং হাউসে এসে ম্যানেজারকে বল্‌লাম সে কথা। সে বল্‌লে,

—যার যখন পাথরের দরকার হয়, তখন সে ওই পরিত্যক্ত পাথরের মন্দিরেই যায়, আর গণেশ মূর্ত্তি ফেলে পাথর নিয়ে আসে। কিন্তু কালো পাথরের

শিবলিঙ্গে হাত দেয় না। ভয় পায়। তবু কিন্তু এ-সব হিন্দু মূর্ত্তির পূজা হয় না, কেউ ঢোকেও না ওখানে ঝাঁট-পাট দিতে।

পরদিন আমরা পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা হলাম। কমীর-সঙ্গীর পিঠে একটা ঝোলা, বৃদ্ধের পিঠে রাইফেল, হাতে টিফিন কেরিয়ারে খাবার, আমার হাতে বৃদ্ধের পিস্তল। পথ সে নয়, গাছের ফাঁকে ফাঁকে চলা।

সাপ পথে পড়লো রকম রকম, বড় ছোট। আদিম জাতের লোকটা চলেছে আগে, সাপ দেখলেই ঝোলা থেকে একটা শিকড় বার করে আর মুখ বুজে একটা আজব শব্দ করে। সাপটা সরে না যাওয়া অবধি আমরা দাঁড়িয়ে থাকি। এমনি করে হচ্ছি অগ্রসর। অর্দ্ধপথে একটা খানার ধারে মৃতদেহ একটা ফুলে রয়েছে, কিন্তু মড়ার হাত-পা-গা থেকে খাবলে মাংস খেয়েছে হয়তো শেয়ালে। আবার দুটো শেয়ালও সেখানে মরে পড়ে আছে। সঙ্গী লোকটা বৃদ্ধকে কি বল্‌লে। বৃদ্ধ আমায় জানালো—মড়াটা সাপে কাটা, সেজন্য শ্মশানে নিয়ে পোড়ানো হয় নি। বিষাক্ত ও-মাংস খেয়ে শেয়াল দুটো মরেছে। কি ভয়ঙ্কর সাপের বিষ।

আর একটু দূর গিয়েই লোকটা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পিছিয়ে এল। আমরা চেয়ে দেখি ছোট একটা সাপ, কিন্তু চোখ দুটো থেকে যেন বহ্নিশিখা ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে। আরো কি আশ্চর্য্য! যে সবুজ পাতা ওটার গায়ে লাগে সে পাতাই যেন আগুনে-পোড়া বিবর্ণ হয়ে যায়। সর্ব্বনাশ! বৃদ্ধ গুলী কর্‌তে যাচ্ছিল, লোকটা বৃদ্ধের বন্দুক ধরে চীৎকার করলো—নাগরাজ! নাগরাজ! ন হন্মু।

বুঝলাম গুলী করতে মানা করছে। কিন্তু একেবারে সংস্কৃত হন্‌ ধাতুর প্রয়োগ। তবু এরা স্বীকার করে না ভারত থেকে এসেছে।

দুপুরের পর পৌঁছে গেলাম ওদের পল্লীতে। পাহাড়ে-ঘেরা পল্লী। পাহাড়ে কেউ ওঠে না। কারণ পাহাড়-গুহায় আছেন সন্ন্যাসিনী। খান পনর-ষোল ঘর, উঁচু মাচার ওপর। মই বেয়ে একটা ঘরে উঠে আমরা বিশ্রাম করলাম। তার পর কূয়োর জলে স্নান করে খাওয়ার পাট শেষ করলাম টিফিন কেরিয়ার থেকে। কমীররাও কিছু খাবার এনে দিল, ভূঁইফুল (mushroom), খাওয়া মন্দ হলো না। আমরা সিগারেট ধরিয়েছি, আর অদ্ভুত সাপের কথাই চল্‌ছে। এদিকে পল্লীর সকল নরনারী এসে জড়ো হয়েছে। তারা ক্রমাগত ডুগডুগি বাজাতে লাগলো।

আমাদের সঙ্গী লোকটি এসে আমাদের ডেকে নিল, আমরা চললাম সন্ন্যাসিনী

দর্শনে। সারা চড়াই পথ ওরা ডুগডুগি বাজিয়ে গান গাইলো—কীর্ত্তন গোছের গান, কেবল বুঝলাম দুটি কথা আর তা হলো 'ক্ষমী-রাণী।'

পাহাড়ের একট গুহা, অন্ধকার, ভিতরে সাপ আছে কি বাঘ আছে তা কে জানে। বড় একটা মশাল জ্বালানো হলো। ভিতরে প্রবেশ করতেই পা শির শিব করে উঠলো এমনি ঠাণ্ডা, আর ধূপ-ধূনোর ধোঁয়া, ইস্! তার যা গন্ধ বিদ্ঘুটে গা বমি বমি করে। কিছুদূর সুড়ঙ্গ পথে এগিয়ে হঠাৎ আমার চোখে পড়লো একটা ওরাং-ওটাং। কামড়াবে না তো? বৃদ্ধও দেখছি থ' মেরে গেছে।

তেলের প্রদীপ একটা মিট্ মিট্ করে জ্বলছে। আগুন কুণ্ড একটা। তাতে মাঝে মাঝে ছুড়ে দিচ্ছে কি কালোপানা তাল, তাল।

মুহূর্ত্তে গুটি-সুটি মেরে বসা ওরাং-ওটাং-য়ের কণ্ঠে কীর্ত্তন গান—ক্ষমীরাণী।

ভক্তেরা সব হাতজোড় করে বসে পড়লো—নমস্কান্! নমস্কান্!

ভাল করে চেয়ে দেখি ওটা ওরাং ওটাং নয়, অতি জরাজীর্ণ এক বৃদ্ধা, গায়ের লোল-চর্ম্মে এমনি ভাঁজ যে দূরে থেকে পশম বলে মনে হয়। ওঃ এই বুঝি সন্ন্যাসিনী! সে কাকেও একটি কথাও বল্লে না, কারু দিকে তাকালেও না। পরিষ্কার পালিভাষায় বলে চল্লো—স্তব-গান শেষ করে—

—"সে ছিল ওক্কার ওয়াট রাজ্য। সারা ওক্কার পাহাড়টা জুড়ে, যেটা এখন ইন্দোচীনে নিয়ে যুক্ত করেছে ফরাসীরা। তা বলে পাহাড়ের ওপরে বাড়িঘর নয়। সুড়ঙ্গ কেটে হয়েছিল রাস্তা, আর তার দুপাশে পাহাড়ের ভিতরটা কুরে-খুদে করা হয়েছিল যত বাড়ি, বাহির থেকে কিছুই নজরে পড়তো না। পাহাড়ের তল থেকে সিঁড়ি একশত পঞ্চাশ ধাপ, তা আবার এত চওড়া যে পঞ্চাশ জন লোক একসঙ্গে পাশাপাশি উঠতে নাবতে পারতো। সে বিরাট সিঁড়ির মাথায় পাহাড়ের ওপরে ছিল চত্বর, পাঁচ হাজার লোকের দরবার করার মত বিস্তৃত। সেখানেই হতো রাজ্যের রাজসভা।

"চত্বরের পর পাহাড়ের গায়ে সিংহদ্বার পাল্লা বা আবরণহীন। সিংহদ্বারে ঢুকলেই ডাইনে-বাঁয়ে দুদিকে দুটি সুড়ঙ্গ—রাজ্যের রাজপথ। সুড়ঙ্গ-মুখ দুটির ঠিক মাঝখানে গড়ে তোলা ছিল মন্দির, যেন সিঁড়ি দিয়ে চত্বরে উঠলেই মন্দির বিগ্রহ নজরে পড়ে। মন্দিরটিও তৈরি পাহাড় চূড়া খুদেই—বাইরে থেকে, নীচে থেকে কেবল পাহাড় আর সিঁড়ির ধাপ লোকে দেখতো আর কিছু মালুম করা সম্ভব ছিল না। সিংহদ্বারের খিলানের ওপর ঠিক কেন্দ্রস্থলে ছিল একটা ফুকোর, তার ভিতর

দিয়ে দিনরাত তীব্র রক্তিম রশ্মিপাত হতো চত্বরে ও সিঁড়িতে। সে রশ্মি আর কিছু নয়, ভিতরকার মহাদেব মূর্ত্তির তৃতীয় নয়নে বসানো বিরাট একটা চুনি।

"সে চুনিটিই ছিল ওঙ্কার ওয়াটের প্রাণ। সকল বিপদ-আপদ আধি-ব্যাধি দূর করবার অব্যর্থ উপাদান। চুনির রশ্মি অন্ধকারেও সদা-আলোকিত রাখতো সিঁড়ি আর চত্বর। কোন প্রহরী থাক্‌তো না সর্ব্বদা উন্মুক্ত সিংহদ্বারে। শত্রুবেশে শস্ত্র নিয়ে কেউ তবু পারতো না কর্‌তে প্রবেশ, চুনির রশ্মি ভস্মসাৎ করতো। কিন্তু ওঙ্কার-বাসীর ওপর সেরূপ দৈব আক্রোশ পাত হতো না।

"রাণী কমী যিনি মহাদেবের কন্যা, তিনিই করেছিলেন রাজ্য গঠন, রাজকার্য্যও কর্‌তেন তিনি। রাজা করতেন সেনা-গঠন আর মৃগয়া। রাজাও রাণীর আদেশমত চলতেন। সে ছিল অতি সুখের রাজ্য। রাণী কমী স্বর্গে চলে যাবার আগে পুত্রদের বলে গিয়েছিলেন, মহাদেবের ত্রিনয়নের চুনিটি যদি খোয়া যায় বা বিগ্রহ থেকে খুলে নেওয়া হয় তবে ওঙ্কার ওয়াট রাজ্য হবে ধ্বংস।

"দু'শ' বছর রাজ্য ছিল ঠিক। তারপরই বিপদ ঘনিয়ে এল অযোধ্যা-পতি রাজারামের পুত্র রাজকুমার কুট রূপে। যুদ্ধ করে ওঙ্কার দখল করতে না পেরে সে করলো প্রতারণা। তখনকার যে রাজা, তার একটি মাত্র ষোড়শী কন্যা, রাণী স্বর্গগত। রাজকুমার কুট ওঝার বেশে ওঙ্কারে প্রবেশ করে রাজকন্যাকে বশ করে। যুদ্ধে রাজা হয়েছিলেন আহত, এখন কুট তাঁকে আরোগ্য করবে বলে প্রলোভন দেখালো। রাজকুমারী কুটের রূপে মুগ্ধ, তাকে স্থান দিল প্রাসাদে।

"ওঙ্কারেশ্বর শিবমন্দিরে দিনরাত ধূপ-ধূনো দেওয়া হতো আফিং আর গাঁজা পুড়িয়ে। সে ধোঁয়া সুড়ঙ্গ-পথে ঢুকে সারা রাজ্য ঢেকে রাখতো আফিং-গাঁজার গন্ধে। রাজকুমারী সে গন্ধ বরদাস্ত করতে পারতো না, ধোঁয়ায় হতো ক্লিষ্ট। তার ওপর আহত পিতার শুশ্রূষা দিনরাত করে সে অনিদ্রায় কাতর। সে দিন শেষরাতে সে যখন দেখলো পিতা ঘুমাচ্ছে, সে আফিমের ধোঁয়া থেকে নিস্তার পেতে চলে গেল সুড়ঙ্গ-পথে সিংহদ্বারে। ভয় তার নাই, স্বয়ং ওঙ্কারেশ্বর শিব রক্ষাকর্ত্তা। সিংহদ্বার পার হয়ে চত্বরে গেল। চত্বর পার হয়ে সিঁড়ির প্রথম ধাপের মাথায়। সেখানে সে মুক্ত বায়ুতে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

"ওঝা-বেশী কুট প্রতি রাতে একক ঘুরে বেড়ায় ওঙ্কারের সোপান-নিম্নে, কোন রকমে প্রবেশ পায় কিনা, চুনির আলো স্তিমিত হয় কিনা। কোনও সময় তারই

সন্ধানে। সেদিন:শেষরাতেও রাজকুমার কুট নীচে দাঁড়ানো ছিল। রাজকুমারীকে দেখে সে নীচে হতে জোড়হাতে জানালো আকুতি—

"দেবী, ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হও, শুধু একবার বলো তুমি মানবী, না অশরীরী!

"সরলা রাজবালা ফাঁদে পড়লো। ওঝাকে নিয়ে এল রাজগৃহে। ওঙ্কারে রাজার গৃহ জাঁকালো ছিল না, অন্য দশজন প্রজার বাড়ির মতই। ওঙ্কারে কোন দিন স্বেচ্ছাচারিতা ছিল না রাজার। সে ছিল পূর্ণ মাত্রায় গণতন্ত্র। সর্দ্দারগণের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই হতো রাজা সকলের সম্মতিতে। রাজার বিরোধী কেউ থাকতো না। তাই রাজগৃহেও প্রহরী রাখা হতো না।

"ওঝা প্রবেশলাভ করে রাজার পরিচর্য্যায় লেগে গেল, রাজকুমারীকে দিল ছুটি। রাজাও ভারি খুশি হলেন মিষ্টভাষী কুটের কথায় ও কাজে। কুটের অনেক ঔষধ অনেক মন্তর জানা ছিল, ভারতবাসী কিনা। সে রাজাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতো যেন রাজকুমারীর সঙ্গে তার কি কথা হয় রাজা না জানে।

"ওঝা বললে, 'মহাদেব মূর্ত্তির চুনিটি এনে ক্ষত স্থানে স্পর্শ করাও।' রাজকুমারী রাজি হলো না। ওঝা জানতো একমাত্র রাজা বা রাজবংশধর ছাড়া সে অধিকার কারু নাই। আর প্রকাশ্যে আনতে গেলে প্রজা বিদ্রোহী হবে, কারণ চুনিটিই রাজ্যের প্রাণ। ধূর্ত্ত কুট এই ফন্দি দিয়ে চুনি সরিয়ে ওঙ্কারকে দখল করতে চায়। রাতদিন রাজকুমারীকে সাধ্য-সাধনা করে দুপুর রাতে গিয়ে চুনি আনতে। রাজকুমারী সে কথা মানে না।

"এখন রাজকুমার কুট জানতো কুহক, গাছের শিকড় একটা প্রলেপ দিয়ে রাজার ক্ষত ও ব্যথা-বেদনা দূর করলো একদিনে। কিন্তু সে জানতো এ আরোগ্য মাত্র তিন দিন স্থায়ী। তার পর যখন ক্ষত পুনরায় দেখা দেবে তখন রাজার মৃত্যু অনিবার্য্য। ওঝার কুহকে ক্ষত আরোগ্য দেখে রাজকুমারী অবশেষে রাজি হলো চুনি আনতে। কারণ ওঝা বললে, ক্ষত সারলেও রাজার দুর্ব্বলতা সারবে না চুনি স্পর্শ ভিন্ন। রাজকুমারী ভাবলো চুনি এনেই পিতার গায়ে ছুঁইয়ে অমনি আবার যথাস্থানে রেখে আসবে। কেউ কিছু জানতেও পারবে না।

"কিন্তু চুনি সরানো মাত্র রাত দুপুরে পিল পিল করে শত্রুসেনা ওঙ্কারে প্রবেশ করলো। রাজার হলো মৃত্যু, রাজকুমারী পিতৃহন্তা কুটকে গোপনে হত্যা করতে যেয়ে প্রাণ হারালো। ওদিকে রাজকুমার কুট চুনিটি হাতে নেওয়া মাত্র তা বাষ্প হয়ে উবে গেল। মহাদেবের তৃতীয় নয়ন হারালো, ওঙ্কারের হলো পতন।

"ওঙ্কার আবার উঠবে যদি কেউ থাকে এমন শক্তিধর যে মহাদেবকে পূজা করে সেই তৃতীয় নয়নের চুনিটি আবার স্বর্গ হতে মর্ত্ত্যে আনতে পারে।"

সন্ন্যাসিনী নীরব হলেন। আর একটি কথাও বলেন নাই বা কোন দিকে তাকান নাই। আমি একটা প্রশ্ন করলাম—ক্ষমীর জাতি মহাদেব-পূজারী হিন্দু ছিল নিশ্চয়, তারা তা হলে ভারতের?

সন্ন্যাসিনী কথা বলেন না কারু সঙ্গে। আমার মনে হল জরাপঙ্গু বৃদ্ধা কানেও শোনেন না, চোখেও দেখেন না। তাই কথা বলেন না।

আবার ডুগডুগি বাজনা, কীর্ত্তন গান—ক্ষমীরাণী! শোভাযাত্রা করে ফের ফিরে এলাম তীর্থদর্শনের পর।

গ্রামের বয়োবৃদ্ধ এলো তিন-চার জন। তারা জানালে সন্ন্যাসিনী কিছু খান না।

—সন্ন্যাসিনী এখানে কতকাল আছেন?

—আমরা জন্মাবধি এ ভাবেই দেখ্‌ছি। বয়স কত হয়েছে সঠিক জানা নেই, হয়তো দু'শ' বছর হবে।

—তোমাদের কারু সঙ্গে কথা বলেন না? নারীদের সঙ্গে?

—না। আমাদের পল্লীতে রোগ হলে কত সাধ্য-সাধনা করেছি, উনি নীরব, নির্ব্বিকার। তাই লোকগুলা ধূনো-কুণ্ডের পাশের মাটি চিম্‌টি কেটে এনে রোগীকে খাইয়ে দেয়। রোগ ভাল হয়ে যায়। তা বলে রোজ কেউ গুহার ভিতরে যায় না। মাসে একদিন আমরা যাই ক্ষমী-রাণীর গান গেয়ে। সন্ন্যাসিনী আজ যা বল্‌লে, সে কথাই সব দিন বলে, অন্য কথা তার মুখে নাই।

আমি ভাবতে লাগলাম বৃদ্ধার মুখের কাহিনীটি নিয়ে। প্রথমতঃ ক্ষমী-রাণী—মহাদেব-কন্যা যখন, তখন তো হিন্দুধর্ম্মের 'লক্ষ্মী"। 'লক্ষ্মী'র ল পরে এনে করা হয়েছে ক্ষমীর (সংস্কৃতে র-ল অভেদ) জাতিটির নাম, ইংরেজীতেও তাই লেখা হয় Khmir; রাজপুত্র কুট্‌ হলো কুশ (রামায়ণের সীতার তনয়) যেমন অরণ্য প্রদেশ-কে বলে অরণ্য প্রদেট্‌। বৃদ্ধার ধূনো-কুণ্ডে কালোপানা তাল পোড়ানো হয়, তা হলো আফিং সেই ওঙ্কারেশ্বর শিব-মন্দিরে যে রীতি ছিল।

দুদিন বিশ্রাম করে যবদ্বীপী বৃদ্ধের কাছে বিদায় নিয়ে রওনা হলাম সীমান্ত উদ্দেশে। বৃদ্ধের কাছে বিদায় যেন ভারত-উপলক্ষিত প্রাচীন শ্যামের

কাছে বিদায়। 'কত যে প্রাতের আশা ও রাতের গীতি, কত যে সুখের স্মৃতি ও দুখের প্রীতি, বিদায় বেলায় আজিও রহিল বাকি।'

বৃদ্ধ বল্‌লে—সীমান্ত দূরে নয়, পার হলেই সাইন পোষ্টে লেখা—Keep to the right! ইংরেজের Keep to the left এর ফরাসী পাল্টা জবাব।

মাইল দুই যাবার পর মোটর বাইকে এল থাই সামরিক অফিসার একটি। এসেই ডাক দিল—Come hither (এখানে এস)।

গেলাম তার কাছে। সে নিয়ে গেল একটা ঝোপের আড়ালে। তারপরই দুটো চক্‌চকে রিভলবার বার করে একটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্‌লে—

Take it. Ten steps, turn and fire face to face, (নাও পিস্তল, দশ-পা যাও, তার পর ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার মুখোমুখি হয়ে গুলী ছোড়)।

Duel! দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ! আমি তো হতভম্ব। মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখি সামরিক পোষাকে মীড্—সেই আমার সঙ্গী।—মীড্ না?

—শাট্ আপ্। আমার অপমানের দাবী এ। চট্‌পট্ পিস্তল হাতে নাও। এস্পার্ কি ওস্পার্। অপমানের ফিল্লে হয়ে যাবে।

- অপমান?

--হাঁ, তুমি স্বামীজীকে বলেছ আমি গণ-বিপ্লবী! পিস্তল ছাড়া আমার সে মানহানির ফারখৎ নেই!

গুলী করতে হয় তুমি কর, বুক পেতে আছি। আমি এশিয়াটিকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরি না, প্রাণ গেলেও না। ভয়ে নয়, জানো আমিও সৈনিক ছিলাম, গুলীর টিপ আমারও মন্দ নয়, মেডেল পেয়েছিলাম, পোষাকে ছিল ষ্ট্রাইপ্। তা ছাড়া আমি প্রাণের মায়া করি না। তা কর্‌লে শত বিপদ মাথায় করে পৃথিবী ভ্রমণ আমার পেশা হতো না।

ও কথা রাখ। আমি রিড্রেস্ চাই, খেসারৎ চাই, পিস্তল—

—শোন তবে আমার কথা। গণ-বিপ্লব শ্যামদেশে চায় রাজাকে তাড়াতে, সেনা-বিদ্রোহ চায় শ্বেত সাম্রাজ্যবাদীকে বিতাড়িত কর্‌তে। একদল মনে করে রাজা গেলে শ্বেতরা আপনি পালাবে, অন্য দল মনে করে শ্বেতদের তাড়ালে রাজা থাইদের মুঠোয় আস্‌বে। কিন্তু কোন দলই ভেবে দেখে না ফল একই হবে, যদিও কর্ম্মধারা আলাদা। রাজা বিপন্ন হলে শ্বেতরা সসৈন্যে এগিয়ে আস্‌বে তাদের পুতুল রক্ষায়। ক্ষুদ্র শ্যামের শক্তি কি সে মিলিত শ্বেত-আক্রমণ

প্রতিরোধ করতে পারে, রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহেই হোক আর শ্বেত-বিরোধী যুদ্ধেই হোক। বিপ্লব-বিদ্রোহ, অনেক ভেবে-চিন্তে কর্‌তে হয়।

—ও-রকম পরিণাম হতে পারে তা তো ভেবে দেখি নি।

—আর তুমি তোমার কল্পিত অপমানের প্রতিকার চাও ইউরোপের মধ্যযুগীয় অন্ধ সংস্কারের পশুবল প্রতিযোগিতায়, যে পন্থা ইউরোপেও শতাব্দী পূর্ব্বেই আইন দ্বারা হয়েছে নিষিদ্ধ। মধ্যযুগীয় ইংলিশ উপন্যাস পড়ে মাথা খারাপ হয়েছে তোমার। দুনিয়ায় প্রগতির চাকা অনেক এগিয়ে গেছে।

মীড্ লজ্জিত হয়ে এসে ক্ষমা চাইলো, করমর্দ্দন কর্‌লো। আজ স্বীকার করলো তারা দুজন সামরিক অফিসার আমার সঙ্গ নিয়েছিল সন্দেহ-বশে।

বিদায় দিলাম মীড্‌কে, সে যেন আধুনিক শ্যামের কাছে বিদায়।

যাত্রাপথে প্রথম স্বাধীন-রাজ্য আমার চোখের সমুখে এল, আবার চলচ্চিত্রের মায়ায় একে একে সরে গেল তার সর্ব্ব-স্বাধীন নর-নারীদল। আজ খুন্ থাইয়ের দেশ দেখা আমার শেষ।

কত যে শ্যামের উষার আলো, কত যে শ্যামের হাসি-গান, কত যে শ্যামের নিরালা দরিয়া আল্‌পনা এঁকে দিল আমার পথের বুকে—শ্যামবাসীর স্বাধীনতা-সরোবরের সে কুমুদ-কহ্লার, বিদায়-বেলায় আজ কারে দিয়ে যাবো উপহার!

হৃদয়ের গুপ্তভাব কে যেন খুলে বল্‌ছে—উপহার যতনে তুলে রাখো মালা গেঁথে, প্রীতি-পুষ্পের সুষমায় যা বঙ্গবাসী গলে পর্‌বে একদিন। সমুখে চেয়ে দেখ অজানার আরতি, অতীতের ভাবাবেশকে পদদলিত করে হও আগুয়ান্, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল—তিন লোকে কোন কিছু থাকে না যেন গুণ্ঠিত।

প্রাণময়ী চেতনা প্রতিধ্বনি করে বিদ্রোহী কবিকণ্ঠের—

'থাক্‌ব না'ক বদ্ধ ঘরে, দেখ্‌ব এবার জগৎটাকে,
কেমন ক'রে ঘুর্‌ছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ দেশান্তরে
ছুট্‌ছে মানুষ কেমন করে!
কিসের নেশায় কেমন ক'রে মর্‌ছে বা বীর লাখে লাখে,
কিসের আশায় কর্‌ছে তারা বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে।'

'সীমার বাঁধন টুটে, দশদিকেতে পড়্‌ব লুটে,' অচিন্ পুরে পুরে উঁকি দিয়ে অজানাকে হাতের মুঠোয় পুরে আন্‌বো।

—শেষ—